প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি।

"আসাম-প্রবাসী" প্রণীত।

"If any man would keep a faithful account of what he had seen and heard himself, it must, in whatever hands, prove an interesting thing."

—*Horace Walpole.*

"—'Tis pleasant, sure, to see one's name in print ;
A book's a book although there's nothing in't."

—*Byron.*

শিলং সাহিত্য-সভা
হইতে
শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৫।১।২ সুকিয়া ষ্ট্রীট, "মণিকা প্রেসে"

শ্রীনটবিহারী ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র।

পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বামাচরণ ঘোষ

শ্রীচরণেষু।

ছোটমামা,

এ সংসারে আমার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করে, এরূপ লোক বিরল। এক দাদাবাবু ছিলেন,—বিধি-লিপি-দোষে অকালে কৃতান্ত-কবলিত হইয়াছেন। এখন আপনিই আমার একমাত্র আশ্রয়-স্থল। এ সংসারে আমার যাহা কিছু—আপনা হইতে; আপনারই আদেশক্রমে, অনিচ্ছা সত্বেও, এই আসামে আসিয়াছিলাম। যখন আসি, এখানকার বৃত্তান্ত পত্রের দ্বারা জানাইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম; সে আজ বহুদিনের কথা—এখন এই "প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি" আপনার গোচর করিয়া কৃতার্থ হইলাম। স্মৃতি বড় ভ্রান্তিময়ী,—সকল কথা স্মরণ নাই, সুতরাং জানান হইল না; তবে এই কয়েকটী কথাতেই আমার অবস্থা-বিপর্য্যয় আপনি কতক পরিমাণে অনুভব করিতে পারিবেন, ও আমার প্রতি অক্ষুণ্ণ স্নেহ-দৃষ্টি রাখিবেন,—ইহাই একমাত্র ভরসা।

চুঁচুড়া,
১৩০১। ১লা মাঘ।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
পাঃ—

পূর্ব্বভাষ।

বঙ্গ-সাহিত্যে ভ্রমণ-কাহিনী নিতান্ত বিরল। উপন্যাসের সরস ভাষায় মন মাতাইতে বঙ্গীয় লেখক যত নিপুণ, দেশের কথা সরল ভাষায় বিবৃত করিতে তত যত্নবান নহেন। সৌভাগ্যের বিষয়, আজ-কাল স্রোত একটু ফিরিয়াছে—ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে কোন কোন লেখকের রুচি জন্মিয়াছে,সঙ্গে সঙ্গে সময়ে সময়ে ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্য সমুজ্জ্বল করিতেছে। "বঙ্গ মহিলার আর্য্যাবর্ত্ত" এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পূর্ব্বে জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ 'হিন্দুর ভ্রমণ বৃত্তান্ত' বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা ইংরাজি ভাষায় লিখিত, ইংরাজি পাঠকের জন্য রচিত—'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিলেও, ইংরাজি ভাবে অনুপ্রাণিত। সে গ্রন্থের সহিত আমাদিগের সহানুভূতি অল্প। পীড়িতা বঙ্গমহিলার স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধায়ক দেশ-ভ্রমণ বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরববর্দ্ধক, সন্দেহ নাই;—'সাম্য-স্বাধীনতা-মৈত্রী'র ঈষদাবছায়া উহার অন্তর্নিবিষ্ট থাকিলেও, বৃত্তান্তটী অতি সুরুচিসম্পন্ন,আর উহার ওজস্বিনী ভাষা বীরপ্রসূ আর্য্যাবর্ত্তের অস্ফুট স্মৃতি উদ্দীপিত করিবার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী।—'দেবগণের মর্ত্তে আগমন' এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে অন্যতর; ইহার রচনা-পদ্ধতি বিচিত্র, দেবগণের দৃষ্টিও অতি অন্তর্ভেদী—সকল ব্যক্তি, বস্তু ও স্থান তাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়াছেন ও পাঠকবর্গকে দেখাইয়াছেন। অরণ্য-পর্ব্বত-সমাকীর্ণ আসাম 'দেবগণের' দৃষ্টিতে 'মর্ত্ত' বলিয়া পরিগণিত হয় নাই, সুতরাং তাঁহারা এখানে 'আগমন' করেন নাই; আর এস্থান বঙ্গ-মহিলাঠাকুরাণীর 'আর্য্যাবর্ত্ত'-ভুক্ত ত নহেই। এক 'উদাসীন সত্যশ্রবা' মহাশয় মাত্র 'আসাম ভ্রমণ' করিয়াছিলেন; আসামের সৌভাগ্যক্রমে, তিনি তাঁহার সেই ভ্রমণ-কাহিনী পুস্তকাকারে গ্রথিত করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। আজ, তাঁহারই প্রদর্শিত পথে

"মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।"

ভাবিয়া, আমাদিগের আসাম-"প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি' লোক-লোচনের গোচর করিতেছি। স্বর্গীয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে সূত্রে 'পালামৌ' গমন

করিয়াছিলেন, আমাদিগের আসাম-প্রবাসের মূলেও সেই সূত্র জড়িত। সুদূর-ব্যাপী অন্তর্দৃষ্টি বলে পালামৌয়ের পার্ব্বত ভুমিতেও স্বর্গীয় মহাত্মা অন্যের অজ্ঞাত ও অলক্ষিত অনেক পদার্থ দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাহা পত্রস্থ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সে স্থলে আমাদিগের 'অস্ফুট স্মৃতি' প্রচার করা নিতান্ত ধৃষ্টতা-পরিচায়ক; তবে, কর-কণ্ডূয়ন-রোগ বড় দুশ্চিকিৎসা—সেই রোগের বিকারে আমরা এই দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। 'আতুরে নিয়মো নাস্তি'—এই প্রবাদ-বাক্য স্মরণ রাখিয়া সহৃদয় পাঠকগণ আমাদিগের কৃত অপরাধ ক্ষমা করিলে চরিতার্থ বোধ করিব।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধই পূর্ব্বে নবজীবন, * নব্যভারত, নব-বিভাকর-সাধারণী, জন্মভূমি, মালঞ্চ, অনুসন্ধান, প্রভৃতি সম্বাদ ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। উল্লিখিত পত্র সমূহের সুযোগ্য সম্পাদকগণ আমা-দিগের ধৃষ্টতায় প্রশ্রয় দিয়া বর্ত্তমান রোগ বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছেন; তজ্জন্য তাঁহাদিগকে—শত্রু বা মিত্র—কি ভাবে অর্চ্চনা করিব, তাহা পাঠকবর্গের বিবেচ্য। যে ভাবেই হউক, তাঁহারা আমাদিগের নমস্য; আজ, এই সূত্রে, তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে অভিবাদন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। প্রবন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হওয়ায় এই গ্রন্থের অনেক স্থলে প্রসঙ্গবিশেষের পুনরুক্তি-দোষ ঘটিয়াছে,—মুদ্রাকর-প্রমাদও বিস্তর রহিয়া গিয়াছে; অন্যাবিধ সহস্র ত্রুটির সহিত এই ত্রুটীও পাঠকগণ উপেক্ষা করেন—ইহাই আমাদিগের বিনীত প্রার্থনা।

আসাম-প্রবাসী।

---

* এই পুস্তকের প্রথম প্রবন্ধ, 'প্রবাসীর পত্র,' ঐ নামেই নব্যভারতে প্রচারিত হয়; পরন্তু, উহাই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে, 'আসাম—শিলং' নামে, নবজীবনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সূচী।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৬	১৩	অসামের	আসামের
৭৮	১	অসাম	আসাম
৮৫	৮	বিশেয	বিশেষ
৮৯	২	কেথাও	কোথাও
৯৫	৯	তুরে	দূরে
৯৮	৩	নমে	নামে
৯৯	১	কয়িয়া	করিয়া
১০০	৯	সংপ্রতি	সম্প্রতি
১১৩	৫	নির্চ্চাচিত	নির্ব্বাচিত
১২৫	৮	অতীত সুতরাং	অতীত; সুতরাং
ঐ	২১	বাঙ্গলী	বাঙ্গালী
১২৬	৮	কয়িয়াছি	করিয়াছি
১৪৭	২০	Chap,	Chap. II,
১৪৮	১২	অবিশ্বাসযোগ্য হয়	অবিশ্বাসযোগ্য বোধ হয়
ঐ	১৩	আগামী	আঙ্গামী
১৪৯	৪	পল্লীতে	পল্লীর
১৫০	শেষ	Vol. II	Vol. II.
১৫১	১২	অভিসার	অফিসার
১৫২	১	কিওইমা	কিগুইমা
১৫৫	১৮	ধনে প্রাণে নিধন পাইল,—স্বয়ং	স্বয়ং ধনে প্রাণে নিধন পাইল,—
১৫৬	১৪	কেহিমার	কোহিমার

প্রবাসের অস্ফুট স্মৃতি।

প্রবাসীর পত্র।

সময়ের গতি অনিবার্য্য, অবিরাম। সময়ের স্রোতে কত মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত, প্রহরের পর প্রহর, দিবসের পর দিবস, বর্ষের পর বর্ষ, যুগের পর যুগ, ভাসিয়া যাইতেছে—ক্ষুদ্র হৃদয় মানবের সাধ্য কি তাহার ক্রমানুসরণ করে? তরঙ্গসঙ্গিনী কুল-কুল-নাদিনী স্রোতস্বিনী অবিচলিত তরঙ্গে তরঙ্গায়িতা, অবিরাম প্রবাহে প্রবহমানা;—ঘটনা-বৈচিত্র্যময় সময়ও বিঘ্ন-বাধা না মানিয়া সংসারক্ষেত্রে বিবর্ত্তন-চক্রে অনিবার বিঘূর্ণিত, সমদর্পে সমান বেগে অনন্তের পথে ধাবমান। সময়ের গতির সঙ্গে, ঘটনার বিচিত্রতার সঙ্গে, আজি আমার

ক্ষুদ্র জীবলীলারও অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। চিরদিন যাহাদের সঙ্গে রস-তরঙ্গে বিভোর ছিলাম, চিরদিন যে স্থান আনন্দ-নিকেতন প্রীতি-ভূমি বোধ হইত, চিরদিন যে আচার-ব্যবহার রীতিনীতি প্রকৃতির সঙ্গে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল—আজি সেই সঙ্গ, সেই স্থান, সেই পদ্ধতি, পরিহার করিয়া ভিন্ন মার্গ আশ্রয় করিতে হইয়াছে। জানি আমি—এত দিন "কূপমণ্ডুক" ছিলাম,—সেই কূপই আমার সারাৎসার শান্তি-স্থল বোধ হইত,—কূপের বাহিরে সংসারের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতাম না,—ভিন্ন প্রকৃতির সংঘর্ষে আসিয়া জগ-তের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে জানিতাম না। সাহস, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ব্যতিরেকে জীবনের উন্নতি হয় না—ইংরাজ স্বদেশ স্বজাতি পরিত্যাগ করিয়া 'সাত-সমুদ্র-তের-নদী' পারে কোথায় আসিয়াছেন ;—আমাদিগের মধ্যেও উন্নতিশীল সম্প্রদায় অধ্যয়ন, পরিভ্রমণ, সন্তান-ইংরেজীকরণ (British-born subjects) প্রভৃতি সদুদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য কত দেশ-দেশান্তরে যাইতেছেন। কিন্তু, তথাপি, মন প্রবোধ মানে না, অতীতের স্মৃতি ছাড়িতে চাহে না, প্রকৃতি সহজে নবীন সংসর্গে মিলিতে অগ্রসর হয় না। বহুদিন মিলনের পর যে বিরহ সহিয়াছে, প্রাণের প্রাণ মনের মন যে একবার হারাইয়াছে, অতীতের সুখ-কল্পনা যাহাকে একবার পাগল করিয়াছে, সেই বুঝিবে—এই পরিবর্ত্তনের কি যন্ত্রণা, সেই জানিবে—এই নব অনুরাগেও পূর্ব্বস্মৃতি কি দারুণ মর্ম্মপীড়ক।

—উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকই যথার্থ বুঝিয়াছিলেন "সেই মুখখানি"র কি মূল্য—"ভুক্তভোগী জনে জ্ঞাত, অন্যে জ্ঞাত কদাচন।"

এই পরিবর্ত্তনের মূলে দাসত্বের দৃঢ় দণ্ড অন্তর্নিবদ্ধ। সেই দণ্ড-ভয়েই প্রাণের অধিকতর ব্যাকুলতা। আমরা পরাধীন ভগ্নোৎসাহী জাতি, দাসত্বের পন্থা ব্যতীত জীবনোপায়ের গত্যন্তর বুঝি না,—আশ্রিত সদা ভীত—সেই ভীতি-বিহ্বল হৃদয়ে পরপদ-সেবা ভিন্ন সার কর্ম্ম চিনি না, চিনিতে চেষ্টাও করি না। একবার ভাবিলাম, এই দাসত্বের অনুরোধে মনের বিরোধে আর প্রবাসে যাইব না, ভিক্ষা সার করিয়াও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব—তথাপি দুশ্চিন্তার স্রোতে অঙ্গ ঢালিব না, নব প্রেমে নব সংসর্গে মিশিব না, সেই 'এক পুরাতনে'ই অনুরাগী থাকিব। কিন্তু সে অনুরাগে নির্ব্বিকল্পতা নাই,—আমি গৃহী, আমি সংসারী, আমি ঘোর পাপী, আমার চিত্তবৃত্তি সদাই চঞ্চল, আমার মনের দৃঢ়তা নাই, সেই নিত্য পদার্থে সম্যক্ আত্মবিসর্জ্জন করিতে শিখি নাই—মন টলিল, কে যেন নিঃশব্দপদসঞ্চারে কর্ণকুহরে বলিল, "ভাই! তোমার কি স্মরণ নাই?—

"মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃকান্তা চ নালিঙ্গতে।
অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ,
তস্মাদর্থমুপার্জ্জয়স্ব চ সখে! হ্যর্থস্য সর্ব্বে বশাঃ।"

ভাবিলাম, সত্যই ত, এখন যাহারা আমাকে সোহাগের পুতুল করিয়া যত্ন করিতেছে, আমার সুখে দুঃখে সহানুভূতি দেখাইতেছে, কাল অর্থশূন্য হইলে আর তাহারা আমার প্রতি চাহিয়াও দেখিবে না, আমার কষ্টের দীর্ঘশ্বাসে একবিন্দু অশ্রু মিশাইবে না। সুতরাং অর্থকরী দাসত্বের পথে, পরিবর্ত্তনের মুখে, অগ্রসর হওয়াই বিধি। চিন্তার উপর চিন্তা বাড়িল—এক দিকে প্রিয়জন-বিরহের চিন্তা, অন্যদিকে জীবনোপায়ের চিন্তা—চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষুদ্র হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল, কিংকর্ত্তব্য অবধারণে অক্ষম হইয়া নীরবে রোদন করিতে থাকিলাম। এমন সময়ে কোন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু, সময় বুঝিয়া, দুর্ব্বলের মহামন্ত্র আমার কর্ণে প্রবেশ করাইয়া দিলেন—

"বর্দ্ধিতা বর্দ্ধতে চিন্তা ত্যক্তা নশ্যতি সত্বরং।
ঈদৃশেনাপি রোগেন দুর্দ্ধীয়ঃ মরণং গতাঃ॥"

"চিন্তা (শোক, ভয়) বৃদ্ধি করিলেই বর্দ্ধিত হয়, (জ্ঞান শক্তির দ্বারা) ত্যাগ করিলেই সত্বরে বিনষ্ট হয়। এমন (দুর্ব্বল বস্তু) চিন্তা-রোগে দুর্ব্বুদ্ধি লোক মরিতেছে। ভাই, মনকে সতেজ কর—মনই মনুষ্যের সুখ দুঃখের হেতু, কাতর হইও না, ঈশ্বর সঙ্গে আছেন, তুমি একা নহ, ভয় কি ?"—আমার জ্ঞানচক্ষুঃ ফুটিল, ভগ্ন প্রাণেও ক্ষণিক নির্ভীকতার ছায়া পড়িল, বুক বাঁধিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলাম,—

আত্মীয়, বন্ধু, প্রিয় পরিজনের নিকট বিদায় লইয়া, একবার প্রেমগদ্গদ ভাবে সকলের সঙ্গে আলাপ আলিঙ্গন করিয়া, একবার উদাসপ্রাণে পরস্পর প্রেমাশ্রু বিনিময় করিয়া, বহু-কালের লীলাভূমি পরিত্যাগ করিলাম।

ইংরাজ-রাজের অনুগ্রহে বাষ্পরথারোহণে কত নদ-নদী অতিক্রম করিয়া, কত পাহাড়-পর্ব্বত ভেদ করিয়া, কত তেপ্রান্তর মাঠ দূরে ফেলিয়া, গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকিলাম। বিহার, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান পশ্চাতে রাখিয়া, ক্রমশঃ, পূর্ব্ব-ভারত ও পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের সঙ্গমস্থলে আসিয়া পৌঁছি-লাম। মধ্যে 'একা নদী বিশ ক্রোশ'—পূর্ব্বে আরোহীবর্গকে নৌকাযোগে এই নদী পার হইতে হইত, এখন মাননীয় লেস্‌লী বাহাদুরের অনুগ্রহে যাত্রীর আর সে কষ্ট নাই, বাষ্পরথারোহণে অনায়াসে ভাগীরথীর বক্ষের উপর দিয়া যাইতেছে। ভাগীরথীর এখন আর সে প্রতাপ নাই, সে তরঙ্গ-তেজের আস্ফালন নাই,—থাকিলেও যাত্রী তাহাতে দৃক্‌পাত করে না; তিনি এখন লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধা, বাষ্পরথের ঘর্ঘর ধ্বনি তাঁহার সে কলধ্বনি ভেদ করিয়া উঠি-য়াছে, তিনি এখন কেবল আকুল প্রাণে কুল-কুল-তানে ক্রন্দন করিতেছেন, এক একবার প্রাণের যাতনায় তটের গায় আছড়াইয়া পড়িতেছেন। কাঁদ মা কাঁদ,এখন আর ক্রন্দন ভিন্ন তোমার অন্তবিধি কি ?—"পরাধীন বন্দীভাবে র'য়েছ যখন !"

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে যাইতে ভয় করে, সদাই বিপদের

আশঙ্কা,—সেই আড়ংঘাটার কীর্ত্তি স্মরণ হইল, প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, যাই কি না যাই অগ্রপশ্চাৎ ভাবিতে লাগিলাম, ক্রমে Darjiling Mail আসিয়া পৌঁছিল, অগত্যা অনিচ্ছাতেও উঠিলাম, বিপদ-ভয়-বারিণীর নাম স্মরণ করিয়া নিঃশব্দে চলিলাম। ভাগ্যক্রমে, দুর্গতিনাশিনীর কৃপায়, কোন দুর্গতি ঘটিল না, পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া, পদ্মা পার হইয়া, উত্তরবঙ্গ পৌঁছিলাম। আসামের পথ বড় দুর্গম, ইংরাজরাজের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও নানাস্থানে উঠা-নামার যন্ত্রণা বিদূরিত হয় নাই। এইরূপ দুই তিন স্থানে উঠা-নামার পর উত্তরবঙ্গ রেলপথের আসাম-প্রান্তস্থ শেষ সীমা যাত্রাপুরে পৌঁছিলাম। সম্মুখে ব্রহ্মপুত্র ধীর গম্ভীর ভাবে প্রবাহিত—রেলওয়ে কোম্পানির ষ্টীমার তীরে সংলগ্ন, রথ ছাড়িয়া পোতে উঠিলাম। পূর্ব্বে আসামের চা-বাগিচার জন্য কুলী-চালানের কথা শুনিয়াছিলাম, কাউনিয়া হইতে সেই অন্তর্ভেদী দৃশ্য সম্মুখে দেখিলাম। অগণ্য কুলী পঙ্গপালের মত চলিয়াছে,সঙ্গে যমদূত বিশেষ রক্ষকগণ বেত্রহস্তে ভ্রমণশীল, সামান্য বা বিনা কারণে কুলীদিগের উপর অজস্র বেত্রবৃষ্টি করিতেছে; দলের মধ্যে বিসূচিকার ভীষণ প্রকোপ,—প্রাণ থাকিতেই কত জননীর অঞ্চলের নিধি, কত স্ত্রীর জীবন-সর্ব্বস্ব স্বামী, কত ভগ্নীর ভ্রাতা, কত পুত্রের পিতাকে অঞ্চল হইতে কাড়িয়া পথে বিসর্জ্জন দিয়া যাইতেছে। এ দৃশ্য দেখিলে ঘোর পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রব হয়। আমার সহযাত্রী একজন সাহেব স্বয়ং কুলী-সংগ্রাহক (recruiter) হইয়াও বলিলেন,—

"most pitiable sight,indeed" ; পরিচয়ে বুঝিলাম, তিনি এ কার্য্যে এই প্রথম ব্রতী। পথে ধুবড়িতে এক দিন বিশ্রাম করিয়াছিলাম ; এই স্থানই এই পরিণাম-বোধ-শূন্য, ব্যাধ-মন্ত্র-মুগ্ধ, সরলপ্রাণ কুলীগণকে দাসখতে আবদ্ধ করিবার রঙ্গভূমি। এখানকার অভিনয় বড় চমৎকার। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সমস্ত কুলীগণকে নূতন বস্ত্র,গাত্রাচ্ছাদন,পানাহারের তৈজসাদি এবং দুই সন্ধ্যা আহার দেওয়া হয়। যাত্রাপুর হইতে কুলী বোঝাই ষ্টীমার প্রায়ই সন্ধ্যাকালে ধুবড়ি পৌছিয়া থাকে ; সে রাত্রি তাহারা সেই স্থানে যাপন করে, পর দিবস প্রাতঃকালে তাহাদিগের দাসখতের বন্দোবস্ত হয়। অর্দ্ধ ঘণ্টা বা তন্ন্যূন সময়ের মধ্যে পাঁচ ছয় শত কুলীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা পূর্ব্বক তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দাসখতের মন্ত্র পাঠ করান হয়। গয়াতীর্থে ফল্গু তীরে শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ দেখিয়া কতক বিস্মিত হইয়াছিলাম, এখানকার মন্ত্রপাঠ ততোধিক বিস্ময়জনক ; সেখানে অর্থলোভী হীনস্বভাব ব্রাহ্মণগণ নগণ্য ইতরজাতীয় পাঁচ ছয় জন যাত্রীকে এককালে শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ করায় ;—এখানকার উচ্চপদারূঢ় ন্যায়বান পাশ্চাত্য পুরোহিত এককালে পাঁচ ছয় শত প্রাণীর দাসখতের মন্ত্রপাঠ সম্পাদন করেন। শ্রেণীর সম্মুখে সেই বেত্রধারী ভোজপুরী রক্ষকগণ দণ্ডায়মান থাকেন—চা-বাগিচার প্রভুদিগের প্রীত্যর্থে ইহারা আপন গৃহের গৃহলক্ষ্মীদিগকেও বাগানে পাঠাইতে কুণ্ঠিত নহেন—ইহারাই বিকট চীৎকারে সেই মহামন্ত্র পাঠ করেন, পশ্চাদ্বর্ত্তী কুলীগণ কেহ কেহ ঐ

কলরবে যোগ দেয়, কি যে বলে, কিছুই বুঝা যায় না, হাঁ—না একই অর্থে গৃহীত হইয়া তাহারা সকলেই দাসখতে আবদ্ধ হয়। ছয় মিনিটের মধ্যে ছয়টী উত্তর-প্রত্যুত্তরের দ্বারা এই অভিনয় শেষ হইয়া থাকে। এই মর্ম্মভেদী ব্যাপার অবলোকন করিয়া একবার নী[illegible] করিলাম, আর বায়ুর সঙ্গে দীর্ঘ-শ্বাস মিলাইয়া একবার অস্ফুট স্বরে বলিলাম—"ভাই, "চির দাস-খতে সমুদায় দিলে!"

ধুবড়ি হইতে আবার সেই ব্রহ্মপুত্র-বক্ষে বাষ্পপোত আরোহণ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অগাধসলিল ব্রহ্মপুত্র আপন গৌরবে আসামের সমস্ত উপত্যকা-ভূমি বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিকাতা হইতে আগমনকালে আসামের প্রথম সীমা যাত্রাপুর হইতে এই কল-কল-নাদী অনন্তকাল প্রবাহমান মহানদের অবিচলিত তরঙ্গ-শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার সে গৌরব হিন্দুর নেত্রে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; তাঁহার জল হিন্দুর দৃষ্টিতে চিরদিন অপবিত্র, কেবল বৎসরের মধ্যে এক দিন—বাসন্তী মহাষ্টমীর দিন—ইহাতে স্নান প্রসিদ্ধ, সেই স্নানে হিন্দুর সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়, স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়। * শুনা যায়, ঐ দিবস মাতৃঘাতী

* ব্রহ্মপুত্রের আবির্ভাব ও পবিত্রতা সম্বন্ধে কালিকাপুরাণে অন্যরূপ তথ্য পাওয়া যায়:—

'ব্রহ্মা শান্তনু মুনির ভার্য্যা অমোঘার গর্ভে জলময় নিজ তনয় উৎপাদিত করিয়া সুবুদ্ধি জামদগ্ন্য পরশুরাম দ্বারা অব্যগ্রভাবে উহাকে অবতারিত করেন;

পরশুরামের কুঠার তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। ব্রহ্মপুত্রোদকের অপবিত্রতা সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে ;—ব্রহ্মকুণ্ড হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মপুত্র যখন আপন বিক্রমে বহিয়া যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে পরশুরামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় ; পরশু-রাম তাঁহাকে সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে আদেশ করেন এবং বলেন "তুমি আর অগ্রসর হইও না, আমি তপস্যা করিয়া তোমার কীর্ত্তি জগতে অক্ষয় করিব, তোমার জল পরম পবিত্র দেববাঞ্ছিত হইবে, তোমার জলে অবগাহন করিয়া লোকে মর্ত্ত্যধামে অমরত্ব লাভ করিবে।" ব্রহ্মপুত্র সেই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন, পরশুরামও প্রতিজ্ঞামত তপস্যা করিতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ক্রমাগত সহস্র বর্ষ-কাল ব্রহ্মপুত্র এইরূপে সে স্থানে অপেক্ষা করেন, তথাপি পরশুরামের প্রত্যাগমন সন্দর্শন না করিয়া তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা

কামরূপ (আসাম) সমস্তই তাহাতে প্লাবিত হইয়া যায়। সেই জলময় ব্রহ্মপুত্র বীয় কামরূপের সমস্ত কুণ্ড প্লাবিত ও সকল তীর্থ আবৃত করিয়া অত্যন্ত গুপ্তভাবে রাখিলেন। যে সকল ব্যক্তি তথায় অন্যতীর্থ বা কুণ্ডের অস্তিত্ব জানেন না, কেবল ব্রহ্মপুত্র নদের অস্তিত্ব অবগত আছেন, তাঁহারা তাহাতে স্নান করিলে কেবল ব্রহ্মপুত্র-স্নান-ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। * * * আর যাঁহারা তথায় তীর্থকুণ্ডাদির বিশেষ বিবরণ অবগত আছেন, তাঁহারা ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিলেই তথাকার সর্ব্বতীর্থ স্নানের ফল সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হন।"

—পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত কালিকাপুরাণের বঙ্গানুবাদ।

বিষয়ে সন্দিহান হইলেন। ওদিকে নবযৌবনসম্পন্না যমুনা অদূরে নব রঙ্গভরে বহিয়া যাইতেছিলেন, মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের প্রতি বিলাস-কটাক্ষপাত করিতেছিলেন; যৌবন-মদান্ধ ব্রহ্মপুত্র আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া তীব্রবেগে বহিয়া যমুনার সহিত মিলিত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে পরশুরাম তপস্যাবলে আপন অভীপ্সিত কামনা সিদ্ধ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে ব্রহ্মপুত্র সমীপে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূরণ অভিপ্রায়ে সমাগত হইলেন; তথায় ব্রহ্মপুত্রকে না দেখিয়া তিনি অগ্রগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মপুত্রের অবস্থান্তর বুঝিতে পারিলেন। তখন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তিনি ব্রহ্মপুত্রকে অভিসম্পাত পূর্ব্বক কহিলেন "তুই যেরূপ কামমোহান্ধ হইয়া আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিস্, তোর জল কুক্কুরের প্রস্রাব অপেক্ষাও হেয় হইবে।" ব্রহ্মপুত্র এই নিদারুণ অভিসম্পাতে নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া পরশুরামের বিস্তর স্তব আরাধনা করিতে লাগিলেন, তখন পরশুরাম কিঞ্চিৎ ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক যে দিন তাঁহার হস্ত হইতে মাতৃহন্তৃ কুঠার ব্রহ্মকুণ্ডে পতিত হয়, কেবল সেই দিনের জন্য ব্রহ্মপুত্রোদকের পবিত্রতা বিধিবদ্ধ করিলেন। এই রূপকের অন্তরালে কি তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য।

ক্রমে ব্রহ্মপুত্র ত্যাগ করিয়া গৌহাটীর উপকূলে বাষ্পপোত হইতে অবতরণ করিলাম, এবং পর দিবস প্রত্যূষে গৌহাটী হইতে পর্ব্বত-বিহারী অশ্ব-যান টোঙ্গা যোগে পর্ব্বতে উঠিতে থাকিলাম। ক্রমাগত ৬৩ মাইল এই টোঙ্গার আশ্রয়ে আসিয়া

আসামের রাজধানী শিলঙে পৌঁছিলাম। ৮।১০ ঘণ্টার মধ্যে এই সুদীর্ঘ পথ আসা যায়। Planters' Stores and Agency Co. 'Ld' নামক কলিকাতাস্থ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় পূর্ব্বে এই অশ্ব-যান পরিচালনের ঠিকাদার ছিলেন; সম্প্রতি শিলঙের প্রধান ব্যবসায়ী গোলাম হায়দার এবং তাঁহার পুত্রগণ ইহার অধ্যক্ষ হইয়াছেন। সাহেবদিগের সময়ে, শুনা যায়, কিছু স্বেচ্ছাচারিতা ছিল, অধুনা এই মুসলমান সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষতায় এই সুদীর্ঘ পথে যাতায়াত পরম সুবিধাজনক হইয়াছে; ইঁহারা স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সর্ব্বদা তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন, এবং আরোহীবর্গের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানে যত্নের ত্রুটি করেন না। অপেক্ষাকৃত সুলভ ব্যয়ে আসা পক্ষে গো-যান অন্যতম উপায়।

আসামের মধ্যে শিলং সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর স্থান। স্বয়ং চিফ কমিশনার বাহাদুর এখানে সদলে বাস করিয়া থাকেন। ইহা খাসিয়া ও জয়ন্তী পর্ব্বতের সীমাভুক্ত। জয়ন্তী পর্ব্বত (Jaintia Hills) পৌরাণিক সময়ে জয়ন্তীপুর নামে আসামের একটী প্রধান জনপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। খাসিয়া পর্ব্বতও না-কি পুরাণে খস-দেশ নামে অভিহিত। এই নাম সম্বন্ধে এক হাস্যোদ্দীপক কিম্বদন্তী শুনা যায়। এই প্রদেশের রাজা পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তথায় কথা প্রসঙ্গে ভীমের প্রতি অসৌজন্য ও গর্ব্ব প্রকাশ করাতে তিনি রোষ বশতঃ ঐ পার্ব্বত্য রাজাকে প্রস্তরোপরি ঘর্ষণ পূর্ব্বক নিধন

করেন। এই ঘর্ষণ হইতে ঘস, এবং তাহার অপ-ভ্রংশ খস। ঘর্ষণ দ্বারা রাজার মৃত্যু হওয়া বশতঃ এই দেশ ঘস বা খস নামে অভিহিত! এই উদ্ভট উদ্ভাবনের কর্ত্তা কে, নির্দ্দেশ করা দুরূহ; বস্তুতঃ ইহা কোন মস্তিষ্ক-পরিচালকের স্ব-কপোল-কল্পনার ফল বলিয়া বোধ হয়। অতিথির,বিনাশ করা দূরে থাকুক, হতাদর—ক্ষত্রিয়ের এবং সমগ্র হিন্দুর কুল-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ; সত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির-প্রমুখ পাণ্ডবগণের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত রাজার বিনাশ সাধন ভীম কর্ত্তৃক সাধিত হইবে, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য কথা। অন্ততঃ, এরূপ নামকরণ সাধিত হওয়ার পূর্ব্বে, এ জাতির অবশ্য কোন আদিম নাম থাকা সম্ভব বোধ হয়; কিন্তু উপস্থিত খাসিয়াগণের মধ্যে তাহা কিছুই শুনা যায় না। খাসিয়াগণ পূর্ব্বে নিতান্ত অসভ্য ছিলেন। অধুনা খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারকগণের শিক্ষকতাগুণে এবং ইংরেজ ও বঙ্গবাসীর সংঘর্ষে সভ্যতার সুন্দর মূর্ত্তি ইহাঁদিগের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে। আদিম খাসিয়াবর্গের ধর্ম্মানুভূতি নিতান্ত কম ছিল; ইহাঁরা উপদেবতার উপাসক ছিলেন, এখনও অসভ্য ও অশিক্ষিত খাসিয়া সমাজে ঐ প্রেতোপাসকদিগের (demon worshippers) সংখ্যাই অধিক। অধুনা অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন, কাহারও ব্রাহ্মধর্ম্মে কিঞ্চিৎ অনুরাগ, আবার কেহ বা হিন্দুধর্ম্মের দিকেও অল্পে অল্পে অগ্রসর।

পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত বলিয়া শিলঙের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সহজেই চিত্তবিনোদনকারী; চতুর্দ্দিকেই অভ্রভেদী শৈল-

মালা সদর্পে মস্তকোত্তোলন করিয়া বিরাজমান,—মধ্যে মধ্যে ময়ূরের কেকা,বনজ বিহঙ্গের কাকলি,নির্ঝরের কুল-কুল ধ্বনি বড়ই শ্রুতিসুখাবহ। এখানকার জলবায়ু আসামের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর,—অধিক কি, ইংরাজেরা ইহাকে Paradise of Assam বলিয়া থাকেন। এখানে পর্ব্বতসুলভ প্রাকৃতিক শৈত্য চিরদিন বিরাজমান; শীতের সময় নবাগত লোকের পক্ষে ইহা কতক কষ্টকর বোধ হইতে পারে, কিন্তু সিমলা বা দার্জ্জিলিঙের মত শীতের প্রকোপ অধিক নহে। বর্ষার ভাগ এখানে অধিক; চিরাপুঞ্জি ভারতের মধ্যে বর্ষা-প্রধান স্থান—ইহার নিকটে অবস্থিতি বলিয়াই, বোধ হয়,এখানে বর্ষার এত প্রকোপ। এখন এখানে বসন্তকাল,—নিম্ন-বঙ্গে মাঘের শেষে ও ফাল্গুনের প্রথমেই যেরূপ নাতি শীত, নাতি উষ্ণ ভাব,যেমন একটু প্রাণ-ভুলানি মন-মজানি ফুর-ফুরে বায়ু, প্রকৃতির যেমন একটু মনোমোহন দৃশ্য, নিদাঘ সমাগমে এখানকার অবস্থা সেইরূপ। অধিকের মধ্যে কখন কখন বৃষ্টির ধারা; অভাবের মধ্যে কোকিলের কুহুধ্বনি—পাপিয়ার দিগন্তস্পর্শী অন্তর্ভেদী মধুর রব। শিলঙের অনতিদূরে একটী জলপ্রপাত আছে; ইহা “Beadon's fall” নামে প্রসিদ্ধ। অত্যুচ্চ পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে তুষারধবল বারিপুঞ্জ অবিরাম গতিতে নির্ঝরিত—প্রকৃতির এই মনোজ্ঞভাব দর্শকের বড়ই চিত্তাকর্ষক, বড়ই নয়নানন্দবর্দ্ধক। শিলঙের সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গও (Shillong Peak) স্বভাবের অন্যতম নিদর্শন; ইহার

উপরিভাগ হইতে সুদূরপ্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রকে না-কি একটী সূত্রখণ্ডের মত দেখা যায়।

এখানে ইদানীং সভ্যতার ও বিলাসিতার উপকরণ সমস্তই আছে। লাটের রাজভবন (Government House) বিলাসীর বিলাস-কানন, ক্রীড়োন্মত্তের ক্রীড়োদ্যান, উপাসকের প্রার্থনা স্থান—কিছুরই অভাব নাই। Dâk Bungalow, Institute, Hotel, Church-yard—ইংরাজ-উপভোগ্য সকলই আছে; ডাক-ঘর, তার-ঘর ত থাকিবেই, Boys' school, Girls' school, Mission school, প্রভৃতিতে পাঠের বন্দোবস্ত আছে। বাঙ্গালীদিগের মধ্যেও এখানে এ সমস্ত বিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। অল্প সংখ্যক লোকের যত্নে এখানে ইংরাজি পড়িবার Reading Club, বাঙ্গালার সাহিত্য-সভা, বঙ্গ-বালিকা-বিদ্যালয়, উপাসকের ব্রহ্ম-মন্দির, আমোদ-প্রিয়ের নাট্যশালা, প্রভৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহা নিরতিশয় প্রশংসার কথা। সকলই আছে, কিন্তু, দুঃখের বিষয়, একটী প্রধান জিনিস নাই—পরস্পর ঐক্য বা মনের প্রীতি এখানে নিতান্ত বিরল। প্রবাসীর মধ্যে কলিকাতা অঞ্চলের, এবং শ্রীহট্ট, আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের লোকই অধিক;—ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে একতার সম্পূর্ণ অভাব, এমন কি, এক স্থানীয় লোকের মধ্যেও অনেক স্থলে মনোমালিন্য লক্ষিত হয়। বঙ্গবাসীর এই অপবাদে প্রায় সর্ব্ব স্থান কলুষিত;—একতার

অভাবে বঙ্গভূমি অনুক্ষণ লাঞ্ছিত, বিধ্বস্ত ও বিদলিত হইতেছে —ইহা দেখিয়াও বঙ্গবাসী একতা শিখিতে পারিলেন না, ইহা সামান্য পরিতাপের কারণ নহে। বাঙ্গালীর এ কলঙ্ক কত দিনে ঘুচিবে, অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। ঐ রূপ সভ্যতা-পরিচায়ক নানারূপ সমাজের প্রতিষ্ঠা না করিয়া যদি অত্রত্য প্রবাসীগণ পবিত্র একতার সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতেন, তাহা হইলে সমাজের সার্থকতা হইত, দেশের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইত, অন্তরে শান্তির সুবিমল জ্যোতি উদ্ভাসিত হইত।

খাসিয়া শৈলের এবং আসামের অন্যান্য স্থানের বৃত্তান্ত সাধ্যমত বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। এখন নিজের কথা আর একবার বলি। দাসত্বের বিনিময়ে, জীবনোপায় নির্দ্ধারণে, বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধে এই প্রবাসের পথে আসিলাম বটে, কিন্তু এখনও ত কৈ মন স্থির করিতে পারিলাম না, অতীতের স্মৃতি এখনও ত অলক্ষ্যে মনকে আলোড়িত করিতে ক্ষান্ত থাকে না, নবীনের আকর্ষণী এখনও ত মনকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না!—কিন্তু হায়! ভ্রান্ত মন এই সামান্য প্রবাসের যন্ত্রণায় অধীর; এই "সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে" মন যে অনুক্ষণ 'দিশেহারা,' তাহা ত একবার ভাবি না, সেই অনন্ত সুখসঙ্গম "নিজ নিকেতনে" কিরূপে ফিরিয়া যাইব—একবার ভ্রমেও ত চিন্তা করি না, আত্মীয় বন্ধু প্রিয় পরিজন, স্বার্থের অনুরোধে সকলেই প্রবাস হইতে প্রবাসান্তরে

যাইতে বলে, কৈ কেহ ত সেই স্বদেশে পরমধামে যাইবার পথ চিনাইয়া দেয় না। ভাই, তোমাদের আত্মীয়তায় নমস্কার!—আমার নবীনে প্রয়োজন নাই, আমার সেই পুরাতনই ভাল, যদি কেহ পার, আমাকে সেই পুরাতন চিনাইয়া দাও, সেই সচ্চিদানন্দের শান্তিধামের পথ দেখাইয়া দাও, আমি মনের সুখে স্বদেশে ফিরিয়া এই মনুষ্য-জনম সফল করি।

দুই চারিটি কথা।

পৌরাণিক সময়ে আসাম নামে কোন জনপদ ছিল না। তখন কামরূপ, শোণিতপুর, কৌণ্ডিল্য, হিড়ম্বা, জয়ন্তীপুর এবং মণিপুর—এই ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন রাজত্ব ছিল। কামরূপ—আধুনিক গোয়ালপাড়া, কামরূপ এবং দরঙের অধিকাংশ স্থান; শোণিতপুর—আধুনিক তেজপুর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান; কৌণ্ডিল্য—ইদানীং সদিয়া ও তদন্তর্গত স্থান; হিড়ম্বা—কাছাড় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান; জয়ন্তীপুর—জয়ন্তী পর্ব্বত (Jaintia Hills); মণিপুর পূর্ব্ববৎ এখনও মণিপুরই আছে।

আসামের অধিকাংশ স্থল বন-জঙ্গল ও পাহাড়-পর্ব্বতে পরিপূর্ণ এবং ঐ সমস্ত বন ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক অসভ্য জাতির বাস। তন্মধ্যে খাসিয়া, গারো, নাগা, অবর, মিশ্‌মি, মিকির, কুকী, আকা, প্রভৃতি জাতির প্রসিদ্ধি অধিক। খাসিয়া পাহাড়ের কথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করা গিয়াছে;

উহার বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী প্রবন্ধে লেখা গেল। বর্ত্তমান ভৌগোলিক অবস্থা হইতে বোধ হয়, উহা পৌরাণিক জয়ন্তী-পুরের অন্তর্গত। পুরাকালেও নাগা ও আকাজাতি বিদ্যমান ছিল। নগ্ন, অর্থাৎ উলঙ্গ, হইতে নাগা নাম নিষ্পন্ন; বস্তুতঃ এখন পর্য্যন্ত নাগারা প্রায় উলঙ্গাবস্থাতেই থাকে। অঙ্কিত করা বা 'আঁকা' হইতে আকা নাম অভিহিত; প্রকৃতপক্ষে আকাজাতি এখন পর্য্যন্ত যুদ্ধবিগ্রহ কালে আপন আপন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নানারূপে অঙ্কিত করিয়া থাকে।

প্রাচীন হিড়ম্বা—আধুনিক কাছাড়—এর কোন কোন জাতি মধ্যম পাণ্ডব ও তাঁহার অন্যতমা পত্নী কাছাড়রাজ-দুহিতা হিড়ম্বা প্রসূত ঘটোৎকচের বংশ সম্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করে। এ কারণ এই সকল জাতি এখন পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়, বর্ম্মণ্ উপাধি গ্রহণ করে এবং যজ্ঞসূত্র ধারণ করে। কাছাড়ের লোক এখন ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে, ভিন্ন ভিন্ন নামে, আসামের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগের নাম তোংলা, রাদা, হুন, মিকির এবং মাদাহি। মিকির জাতিকে এখন পর্য্যন্ত নওগাঁ, খাসিয়া এবং নাগা পর্ব্বতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মিকির জাতি কাছাড়রাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হয়; ইহারা অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপরি অসাধারণ ক্ষিপ্রতাসহকারে উঠিতে পারে; ইহাদিগের অপর নাম 'করবী'।

আসামে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজাগণ

আধিপত্য স্থাপন করেন। তাঁহাদিগের ধারাবাহিক শাসনকাল নির্ণয় করা দুরূহ। "আসাম বুরঞ্জী" নামক গ্রন্থ সমূহে যে সমস্ত তথ্য অবগত হওয়া যায়, তাহার সকল ভাগ বিশ্বাসযোগ্য বোধ হয় না, এবং সেই সমস্ত বিশ্লেষণ করিয়া প্রকৃত ঘটনা নিরূপণ করাও বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ঐ সমস্ত নৃপতিকুলের মধ্যে 'আহম' জাতির প্রসিদ্ধি অধিক; বস্তুতঃ আহম জাতি হইতেই এই প্রদেশের নাম আসামে পরিণত হইয়াছে। ইহারা ব্রহ্ম (Burmah) এবং শ্যাম (Siam) প্রদেশ হইতে আসিয়া প্রায় ছয় শত বৎসর কাল আসামে রাজত্ব করেন। পূর্ব্বকালে তাঁহারা অহিন্দু ও প্রেতোপাসক ছিলেন, পরে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং আপনাদিগকে অমরাধিপতি ইন্দ্রের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। এখন তাঁহাদিগের অতি হীনাবস্থা; তাঁহাদিগের রাজত্বকালীন কীর্ত্তির চিহ্ন এখনও অনেক পরিমাণে শিবসাগর জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়।

খাম্‌টী জাতিও, বোধ হয়, শ্যাম (Siam) প্রদেশ হইতে আসিয়াছে। ইহাদিগের লিখিত ভাষা আছে। ইহাদিগের আচার, ব্যবহার, ভাষাবিজ্ঞান—সমস্তই প্রায় শ্যামবাসীদিগের ন্যায়। খাম্‌টী ভূমির অনতিদূরে স্তুবর জাতির বাস। এক সময়ে ইহারা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং তিব্বত ও চীনদেশের সহিত বাণিজ্যাদি করিত। ইহাদিগের পার্শ্বেই মিশ্‌মি বা মিমি জাতির বাস। ইহাদিগেরই সীমা মধ্যে

হিন্দুর পবিত্র তীর্থ পরশুরামকুণ্ড বা ব্রহ্মকুণ্ড অধিষ্ঠিত। মাতৃঘাতী পরশুরামের কুঠার এই কুণ্ডে তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। চুতিয়া জাতি দরঙ্ জেলায় বাস করে। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দু এবং কেহ প্রেতোপাসক। বোধ হয়, ইহারা বিদেশী—আসামে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

আসামে এক সময়ে 'পাল'-রাজগণের আধিপত্য ছিল; ধর্ম্মপাল নামক রাজা ইহাদিগের মধ্যে প্রথম। কেহ কেহ বলেন, ইনি বঙ্গদেশীয় পালবংশেরই কোন একজন রাজা; আবার কাহারও মতে তিনি উপরিলিখিত চুতিয়া জাতিরই রাজা ছিলেন,—তাহাদিগেরও উপাধি 'পাল'। তিনি যে বংশীয় রাজাই হউন, ইতিহাস-লেখক তাহা নির্ণয় করিবেন; আমরা কেবল তাঁহার বংশ-ঘটিত একটী কথার উল্লেখ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকের কৌতূহল দূর করিব। বঙ্গের 'খোসগল্পে' "হবচন্দ্র রাজার গবচন্দ্র মন্ত্রী"র আখ্যায়িকা অনেকেই শুনিয়াছেন; শুনা যায়, এই হবচন্দ্র উক্ত ধর্ম্মপালের সহোদর মাণিক চন্দ্রের পৌত্র। মাণিকচন্দ্রের অল্পবয়সে মৃত্যু হওয়ায় তৎপত্নী ময়নাবতীর চেষ্টায় তদীয় শিশু গোপীচন্দ্র ধর্ম্মপালের সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন; কালক্রমে, এই গোপীচন্দ্র বিষয়-বিরাগ বশতঃ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিলে, তাঁহার পুত্র হবচন্দ্র আসামের আধিপত্য লাভ করেন। এই হবচন্দ্র অতিশয় নির্ব্বোধ ছিলেন, এবং মণিকাঞ্চন সংযোগের ন্যায় ততোধিক নির্ব্বোধ গবচন্দ্র তদীয় মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

হবচন্দ্র গবচন্দ্রের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় অনেকেই শ্রুত আছেন—রাত্রিকালে বিষয়-কার্য্য এবং দিবাভাগে নিদ্রা, তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মুসলমানেরা যে সময় আসাম প্রদেশ আক্রমণ করেন, তখন পর্য্যন্ত কামরূপ রাজ্য বলবীর্য্য ও ধনধান্যে প্রভূত গৌরবান্বিত ছিল। পুরাকালে, পূর্ব্বে দিক্-কর-বাসিনী নদী, পশ্চিমে রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদীর তীর, উত্তরে কঞ্জগিরি এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদ ও লাক্ষা নদীর সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত উহার বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সমৃদ্ধিশালী জনপদই সমস্ত আসাম প্রদেশের সার ভাগ; ইহার ইতিহাসই সমস্ত আসামের গৌরবস্বরূপ। ইহার মধ্যে প্রধানতঃ চারিটি বিভাগ ছিল—কামপীঠ, রত্নপীঠ,স্বর্ণপীঠ, এবং সৌমারপীঠ। এতদ্ভিন্ন যোগিনীতন্ত্রে আরও অনেক পীঠ ও উপপীঠের কথা ব্যক্ত আছে; ধর্ম্মপিপাসু সাধকের নিকট তাহাদিগের মাহাত্ম্যের তারতম্য বিবেচ্য। করতোয়া এবং সঙ্কোষ (প্রাচীন স্বর্ণকোষী) নদীর মধ্যস্থ ভূভাগের নাম কামপীঠ। যোগিনীতন্ত্রের মতে কামপীঠেরই অপর নাম যোনিপীঠ; যোনিপীঠের বর্ত্তমান নাম কামাখ্যা—কামগিরির উপরে অবস্থিত বলিয়া উহার কামপীঠ নাম হইয়া থাকিবে।—সঙ্কোষ আধুনিক কুচবেহার রাজ্যের সীমারেখা; ঐ সঙ্কোষ হইতে রূপিকা নদীর কূল পর্য্যন্ত ভূভাগের নাম রত্নপীঠ; আধুনিক গোয়ালপাড়া এবং কামরূপের কিয়দংশ ইহার অন্তর্গত।—

উল্লিখিত রূপিকা নদী হইতে ভৈরবী নদী পর্য্যন্ত স্বর্ণপীঠ; আধুনিক কামরূপের প্রায় সমস্ত এবং দরঙের প্রায় অর্দ্ধভাগ স্বর্ণপীঠের অধীন। কালিকাপুরাণ বা যোগিনীতন্ত্রে এই স্বর্ণপীঠের কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু কালিদাসকৃত রঘুবংশে রঘুদিগ্বিজয় প্রসঙ্গে যে হেমপীঠের * কথা দেখা যায়, সম্ভবতঃ তাহা এই স্বর্ণপীঠের নামান্তর মাত্র।—ভৈরবী হইতে পূর্ব্বোক্ত দিক্-কর-বাসিনী বা দিক্রাই নদী পর্য্যন্ত সৌমার-পীঠ। যোগিনীতন্ত্র মতে ইহার পূর্ব্বদিকে সৌরশিলারণ্য, পশ্চিমে স্বর্ণশ্রী নদী, দক্ষিণে ব্রহ্মযূপ ও উত্তরে মানস-সরোবর। ফলতঃ, দরঙের কিয়দংশ এবং লক্ষ্মীপুরের অধিকাংশ ঐ প্রাচীন সৌমারপীঠের অন্তর্ভুক্ত।

এতদ্দ্বারা দেখা যায়, কামরূপ রাজ্যের সমৃদ্ধি সময়ে কুচবেহার, জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর, এমন কি শ্রীহট্ট এবং ময়মনসিংহের উত্তর ভাগ পর্য্যন্ত উহার অন্তর্গত ছিল। কুচবেহারের অধীন কামতাপুর কিছু কাল এই বিস্তৃত রাজ্যের রাজধানী ছিল। "কাম হরকোপানলে দগ্ধ হইয়া আবার মহাদেবের অনুগ্রহেই এই পীঠে আসিয়া রূপ ধারণ করেন, এই নিমিত্ত তদবধি এই পীঠ 'কামরূপ' নামে

* "কামরূপেশ্বরস্তস্য হেমপীঠাধিদেবতাম্।
রত্নপুষ্পোপহারেণ ছায়ামানর্চ্চ পাদয়োঃ।"

—রঘুবংশ।৪।৮৪।

অভিহিত।” † পুরাকালীন বিখ্যাত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অধুনা গৌহাটী (গুয়া-হাটী = সুপারির বাজার) নামে খ্যাত ; ইহা এক সময়ে আহমজাতির রাজপ্রতিনিধির এবং মগদিগের প্রভুত্বকালে তাহাদিগের রাজ-পারিষদ ও সৈন্যসচিবদিগের বসতিস্থল ছিল। অধুনা ইহা আসামের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জনপদ কামরূপের রাজধানী। মহাভারত, কালিকাপুরাণ,যোগিনী-তন্ত্র, প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সমূহে সমগ্র কামরূপের এবং তথাকার রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় ; অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ ঐ সমস্ত পুরাণ তন্ত্রাদি হইতে পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারেন। এই গৌহাটীতে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ কামাখ্যা দেবীর মন্দির অধিষ্ঠিত। সহর হইতে ইহার ব্যবধান প্রায় দেড় ক্রোশ। প্রাচীন আখ্যায়িকা মতে কামাখ্যা দেবীর মন্দির কামপীঠের অংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু উপরিলিখিত সীমা নির্দ্দেশ অনুসারে উহা সুবর্ণপীঠের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

† পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত কালিকাপুরাণের বঙ্গানুবাদ, ৫১ অধ্যায়, দেখুন।

বিহু।

আজ মহাবিষুব সংক্রান্তি। হিন্দুর বৎসরের শেষ—মহা আনন্দের দিন। পুণ্য-তোয়া ভাগীরথী-তীরে, ত্রিবেণীর সঙ্গমস্থলে, প্রয়াগের পুণ্যক্ষেত্রে—সর্ব্বত্র আবালবৃদ্ধবনিতা স্নানদানাদি শুভকর্ম্মে নিরত; বুঝি তাহাদিগের ইহজীবনের সমস্ত পাপ এই পবিত্র স্নানে বিধৌত হইবে। দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে কি অনির্ব্বচনীয় শোভা! বিশ্বেশ্বরের মস্তকে সকলে জল-দুগ্ধ সিঞ্চন করিতেছে, চন্দনচর্চ্চিত ফুল-বিল্বপত্রে শ্রীপাদপদ্মে সকলে ভক্তিভরে 'অঞ্জলি' নিক্ষেপ করিতেছে, 'বম্-বম্ হর-হর' ধ্বনিতে দেবমন্দির প্রতিধ্বনিত এবং মধ্যে মধ্যে ব্রতধারী সন্ন্যাসীগণের 'জয় শিব' রবে দিগন্ত নিনাদিত হইতেছে। পরম যোগী যজ্ঞেশ্বরের মহাসন্ন্যাসে বিভোর হইয়া মায়া-মুগ্ধ মনুষ্য দু'দশ দিনের জন্য সন্ন্যাসব্রত ধারণ করিয়াছিল, আজ তাহার সেই ব্রত সাঙ্গের দিন।—ইংরাজ শাসনে আর পূর্ব্বের মত 'চড়ক-পূজা' নাই, তথাপি

আনন্দোচ্ছ্বাসে ভক্তের হৃদয়ে অমৃত-প্রস্রবণ উৎসারিত হইতেছে। আজ আবার ঘটোৎসর্গ;—হিন্দু স্বর্গীয় পিতৃ-পিতামহাদি মাতৃ মাতামহাদি আর্য্যগণের পুণ্য-স্মৃতি উদ্দীপন করিবার জন্য তাঁহাদিগের চরণোদ্দেশে নির্ম্মল গঙ্গাজল উৎসর্গ করিতেছেন, মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে স্বর্গীয় মহাত্মাগণের পবিত্র সত্ত্বা যেন ক্ষণেকের জন্য অন্তরাত্মায় উদ্ভাসিত হইতেছে।

প্রিয় বঙ্গে আজ "চড়ক পূজা"। আসামে আজ 'বহাগ বিহু'। 'বিহু' শব্দ, সম্ভবতঃ, বিষুব শব্দের অপভ্রংশ; * 'বহাগ' স্পষ্টতঃই বৈশাখের রূপান্তর। বাঙ্গালায় 'মহাবিষুব' কথাতেই চৈত্রসংক্রান্তি বুঝা যায়, কিন্তু আসামে এই বৈশাখ 'বিহু' ভিন্ন অপর দুই 'বিহু'র প্রসিদ্ধি থাকায়, ইহা স্পষ্টতঃ "বহাগ বিহু" নামে পরিচিত। তবে এই বিষুবই মহাবিষুব বটে—ইহা আসামীগণের 'বর্ডাল বিহু'। অপর দুই 'বিহু', যথাক্রমে, "কাতি (কার্ত্তিক) বিহু" এবং "মাঘ বিহু" নামে

* আসামের অধিবাসীগণ 'শ' উচ্চারণ করিতে পারেন না। তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ভেদে তিন প্রকার উচ্চারণ হওয়া দূরে থাকুক, 'শ' মাত্রেই আসামীগণ 'হ' আদেশ করেন। এই কারণ অনেকে প্রাচীন আহম জাতি হইতে আসাম প্রদেশের নামকরণ স্থির করিয়া থাকেন। স্থানবিশেষে 'স' স্থানে আসামীগণ 'খ' বা 'ক'ও উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

প্রসিদ্ধ। কাতি-বিহু সর্ব্বাপেক্ষা 'কঙাল', 'মাঘ' তদপেক্ষা 'ভোগোল', কেবল 'বহাগ'ই 'বর্ডাল'।+

আসাম, স্বভাবতঃ, কৃষি-প্রধান দেশ। কৃষিজাত দ্রব্যেই অত্রত্য অধিবাসিগণ স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। চতুর্দ্দিকেই সবুজ শ্যামল শস্যক্ষেত্রের রমণীয় শোভা দর্শনে আপামর সাধারণ সকলের চিত্ত উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠে। সভ্যতার 'আব্‌ছায়া' অল্পে অল্পে দেখা দিলেও, বাষ্পপোতের কল্যাণে দেশের শস্য দেশান্তরে চলিয়া গেলেও, আসাম এখনও কৃষিশূন্য হয় নাই, অন্তঃশূন্য ভূয়া সভ্যতার কুহকে পড়িয়া আসামী এখনও নিজের উদর-পূর্ত্তির জন্য পরমুখ-প্রেক্ষী হয় নাই, এখনও রাজসেবার অনুরোধে স্বদেশ ছাড়িয়া বিদেশ যাইতে শিখে নাই। এখনও আসামে কৃষি-কার্য্যের সম্যক্ আদর আছে,—দুই-দশ জন ভিন্ন, এখনও আসামী মাত্রেই স্বদেশজাত স্বকৃষিপ্রসূত শস্যে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। 'নিভাঁজ' দেশী জিনিসই যে আসামীর দৈনন্দিন আহারের একমাত্র উপকরণ, তাঁহার বারমাসের bill of fareই তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ!—

"জ্যৈঠী দই, আহাড়ে খই,
হাওনে মরপটা খবা গই,

+ কঙাল—দরিদ্র, নিকৃষ্ট। ভোগোল—মধ্যমরাশি। বর্ডাল,—বড়, শ্রেষ্ঠ।

ভাদোয় ওউ, আহিনে কল,
কাতি কণ্ডু দুগুণ বল,
অঘানে পুই, পুহি ঘুই,
মাঘোর পণ্টা রুদ্রু ছুই,
ফাগ্‌নি ত্যাল্, চৈতি ব্যাল,
বহাগে লারুপিটা হেলায় গেল্।" *

'বিহু' এই কৃষি-জীবনের সাময়িক আনন্দোৎসের বিকাশ মাত্র। এখন সংক্ষেপে এই 'বিহু'ত্রয়ের বিবরণ বলা যাউক।

বঙ্গের জল-বিষুব সংক্রান্তি আসামে 'কাতি বিহু।' পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, 'কাতি-বিহু কঙাল'—ইহাতে উৎসবের তাদৃশ জমাট নাই। কার্ত্তিকে নবতৃণে নূতন ধান্যের কেবলমাত্র 'থোড়' উঠিয়াছে, তখন তাহার উপর সম্পূর্ণ ভরসা নাই—'হাজা শুকা'য় তাহা অকালে বিনষ্ট হইতে পারে—এই জন্য কার্ত্তিক বিহুর উৎসব আড়ম্বরশূন্য। এ 'বিহু' উপলক্ষে সংক্রান্তির সন্ধ্যায় সকলে আপন আপন গৃহে

---

* জ্যৈষ্ঠে দধি, আষাঢ়ে খই, শ্রাবণে পাট-শাক, ভাদ্রে চাল্‌তা, আশ্বিনে রম্ভা, কার্ত্তিকে দ্বিগুণ বলকারক কচু, অগ্রহায়ণে পুঁইশাক, পৌষে অগ্নিসেবন, মাঘে রৌদ্রে পিঠ দিয়া 'পান্ত-ভাত', ফাল্গুনে তৈলমর্দ্দন, চৈত্রে শ্রীফল এবং বৈশাখে হেলায় শ্রদ্ধায় পিষ্টক (গুড়পিঠা) ভক্ষণ বিধি।

'তুলসী' রোপণ করিয়া তাহার তলে প্রদীপ দেয় এবং কৃষির ফলবৃদ্ধির জন্য সর্ব্বকর্ম্ম-ফলপ্রদ ভগবানের নিকট কায়মনে প্রার্থনা করে। পরদিন প্রাতে সকলে নিজ নিজ শস্যক্ষেত্রের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে যায়; কৃষিজীবী সরলপ্রাণ আসামীর অন্তরে ভক্তির এতই একাগ্রতা যে, 'বিহু'র রাত্রের ক্ষণিক স্তুতিতেই করুণাময় বিধাতা রাত্রি মধ্যে তাহাদিগের শস্যক্ষেত্রের অবস্থার উন্নতি বিধান করিয়াছেন—ইহাই তাহাদিগের ধ্রুব বিশ্বাস। এ 'বিহুর' ব্যাপার ইহাতেই শেষ।

ক্রমে অগ্রহায়ণ পৌষে কৃষকের আশা পূর্ণ হইল; তাহার সাধের ক্ষেত্র নবধান্যে পরিপূরিত দেখিয়া হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এবং সেই ধান্য কর্ত্তিত হইয়া গৃহজাত হইলে আনন্দ-স্রোত একেবারে উছলিয়া পড়িল। এই আনন্দের পরিণাম 'মাঘ-বিহু।' বঙ্গের উত্তরায়ণ সংক্রান্তি আসামের 'মাঘ-বিহু'।—ইহা

"অগ্রহা'ণে ধান-কাটা নবান্ন সুন্দর,
পোউষে বাউনি-বাঁধা পিঠে ঘর-ঘর"—

এই দুই গ্রাম্য উৎসবের সমবায় ও রূপান্তর মাত্র; অধিকন্তু "আশ্বিনে অম্বিকা-পূজা"র পরিবর্ত্তে এখানে নূতন বসন পরিধানেরও এই সময়। বস্তুতঃ, নবান্ন-ভোজন ও নববস্ত্র-পরিধানই মাঘ-বিহুর কাণ্ড। ইহা ভিন্ন এ উৎসবের আরও একটু অনুষ্ঠান আছে।—সংক্রান্তির দিবস সকলে

গ্রামস্থ নদীতীরে, অন্য জলাশয় সমীপে, বা অভাবে মাঠের মধ্যে, জ্বালানী কাষ্ঠ দ্বারা স্তম্ভের মত নির্ম্মাণ করে; ইহা 'ভেলাঘর' নামে প্রসিদ্ধ। অবস্থা-ভেদে এক বা ততোধিক ভেলাঘর নির্ম্মিত হয়; তবে, সাধারণতঃ, বাসী, সরু, মাজু এবং বড়—এই চতুর্ব্বিধ ঘর করাই প্রথা। রাত্রি তিনটা হইতে 'বাসী'কে আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে ঐ ভেলাঘরগুলি সমস্ত জ্বালান হয়; প্রাতে সকলে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাহ্নিকাদি সমাপনান্তে ঐ ঘরদাহন-কারী অগ্নিসেবন করে এবং পরে গ্রাম্য ব্যায়াম-ক্রীড়ায় নিরত হয়। মধ্যে মধ্যে 'পদ' গাওয়াও চলে। পূর্ব্বাবধি ব্যবস্থা এইরূপেই অতিবাহিত হয়। পূর্ব্বাহ্নে অনাহারে থাকাই নিয়ম; নিতান্ত অশক্তের পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগের বিধি আছে। অপরাহ্নে ভোজের ধুম পড়ে;— আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদিগের মধ্যে নিমন্ত্রণের বিনিময় নিবন্ধন এই ভোজের স্রোত তিন-চারি দিবস পর্য্যন্ত চলে। আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে "ধাঁদাপিঠা"ই * সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়

---

* 'ধাঁদা'—পিষ্টক বিশেষ। ভিজান চাউল অল্পপরিমাণে ভাজিয়া ঢেঁকিতে কুটিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। আসামীর ইহা সুখাদ্য। 'পিঠা' দুই প্রকার—'তিল পিঠা' এবং 'চুঙা পিঠা'। 'বর্ণি'ক' বা 'বোড়া' চাউল ভিজিয়া নরম হইলে তাহা গুঁড়াইয়া গরম তাওয়ায় ফেলিয়া হস্তের দ্বারা চেপ্টাইলে পিষ্টকাকৃতি হয়; তখন তিল ও গুড়ের পুর দিলে তিল-পিঠা প্রস্তুত হইল। চুঙাপিঠার প্রকরণ কিছু অপরূপ; ঐরূপ চাউল কাঁচা বাঁশের চোঙ্গার মধ্যে পুরিয়া জাল দেওয়া হয়; তাহাতে উহা জমিয়া গেলে পিষ্টকা-

উপকরণ; ইতর, ভদ্র, ধনী, নির্ধন—সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে এই খাঁদা-পিঠার আয়োজন করিয়া থাকেন। এইরূপ 'মধুরেণ' মাঘ-বিহু সমাপিত হয়।

পরিশেষে, বিহুর পরাকাষ্ঠা এই 'বহাগ বিহু'। এখন কৃষকের গৃহ ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ—চাষের জন্য ভূতগত পরিশ্রম নাই, ফসলের প্রতীক্ষায় দুশ্চিন্তা বা মনের অশান্তি নাই—এখন সকলে স্ফূর্ত্তির ফোয়ারা খুলিয়া আনন্দে উন্মত্ত, এখন নৃত্যগীতে সকলে মাতুয়ারা। কাতি-বিহুতে ভোজনের চূড়ান্ত হইয়াছে, এখন বহাগ-বিহুতে নাচ-গাহনার চূড়ান্ত। এ সময় অন্য বিশেষ কোন অনুষ্ঠান নাই, কেবল সামান্য মাত্রায় "গোপার্ব্বণ" আছে। গোজাতি হিন্দুর গৃহদেবতা, বিশেষতঃ কৃষি-জীবীর পক্ষে গরুই একমাত্র অবলম্বন; বারমাস গোসকল কৃষকের নিকট অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছে, এখন কৃষকের সঙ্গে গরুরও বিশ্রামের সময়। তাই, এই 'বিহু' উপলক্ষে, গোসকলকে নদীগর্ভে, বা অন্য জলাশয়ে, যথারীতি স্নান করাইয়া উদর পূরিয়া লাউ এবং বেগুণ খাইতে দেওয়া হয়, লাউ এবং বেগুণের মালা গাঁথিয়া গরুর

কা্রে টুকরা টুকরা কাটিয়া গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া আসামীগণ নিতান্ত তৃপ্তির সহিত ভক্ষণ করেন।

* বঙ্গসুন্দরীগণ তাঁহাদিগের 'পৌষ-পার্ব্বণে'র নিমিত্ত এই 'খাঁদা-পিঠা'র প্রকরণ "পাক-প্রণালী"তে 'নোট' করিয়া রাখিতে পারেন!

গলায় পরাইয়া তাহার শোভা বৃদ্ধিও করা হয়। অক্ষয় এবং অটুট ভাবে গৃহ গোপূর্ণ থাকে—ইহাই কৃষকের অন্যতম ইচ্ছা; তাই গোসেবার সঙ্গে সকলের মুখে আদর-মাখান কবিতা—

"লাউ খা, বগুন খা,
বছর বছর বাড়ী যা।"

গরু অবাধ্য হইল, গো-বৃদ্ধি গরু আদর না মানিয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাব ধারণ করিল, কৃষকের নিকট তাহার নরম-গরম শাসন চলিল,—কখন লম্বা-চৌড়া পত্র খাওয়াইয়া বশে আনিবার চেষ্টা, কখন সুদীর্ঘ যষ্টি প্রহারে আপন আয়ত্ত করিবার যত্ন—কিন্তু সে শাসনের সঙ্গেও সদাই মুখে সেই গো-বৃদ্ধির কামনা—

"দীঘল লাটি, দীঘল পাত,
গরু বাড়ে জাৎ জাৎ।"

এতক্ষণ আমরা 'বিহু'র শুভ্র অঙ্গ দেখাইলাম। উহার কুৎসিৎ অঙ্গ পাঠকের সম্মুখে ধরিতে ইচ্ছা হয় না; কিন্তু এ চিত্র না দেখাইলে 'বিহু' অপূর্ণ থাকিয়া যায়। বস্তুতঃ, 'বিহু'র অভ্যন্তরে এই জঘন্য প্রথা জড়িত না থাকিলে, ইহা অপূর্ব্ব পদার্থ হইত,—কৃষিজীবনের পক্ষে ইহা একটি আদর্শ উৎসব, একটি শিক্ষণীয় সামগ্রী, রূপে পরিগণিত হইত। নব তৃণের

শ্যামল সুন্দর নবীন অবস্থা হইতে গৃহজাত শস্যের উৎকর্ষ পর্য্যন্ত এই ধারাবাহিক আনন্দোৎসব বড়ই মনোরম, সরল-প্রাণ কৃষকের স্ফূর্ত্তি-বিকাশের অতি সুন্দর চিত্র। কিন্তু 'বহাগ' বিহুর লীলা-খেলাই এই মহোৎসবকে কলঙ্কিত করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, নৃত্যগীতই এ 'বিহু'র প্রধান ব্যাপার; ব্যাপার সাধারণ নহে—সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় এক পক্ষ কাল নৃত্য-গীতের স্রোত চলে,—"হাটে ঘাটে মাঠে বাটে" 'ছওয়ালী-পুরুথে'র একত্র সংঘর্ষণ, অবাধ বিচরণ, আর অশ্লীল অশ্রাব্য সংগীতের লহরী উত্তোলন। সংগীতের তরঙ্গে বিভোর হইয়া নবযুবতী পরপুরুষের সম্মুখে দিগম্বরী মূর্ত্তি ধারণ করিতে অকুণ্ঠিত, গানের পরস্পর 'উতরে' ভাষার চরম বীভৎস ভাব অবতারিত। ইহার মধ্যে সপ্তম দিবসের কাণ্ডই কিছু গুরুতর; সে দিন বাৎসরিক 'বিহু'-কীর্ত্তনের নির্দ্ধারিত স্থানে গীত বাদ্য ও নৃত্যের অবিশ্রান্ত তরঙ্গ চলে,—গৃহ-কর্ম্মে মন নাই, সকলেই সংগীতে উন্মত্ত—

"আবেশে অঙ্গ ঢলিয়া পড়ে!"

পরিতাপের বিষয়, জ্ঞানী, রুচিবান, ভদ্র—সকলেই এই বীভৎস ব্যাপারে, ন্যূনাধিক, প্রশ্রয় দেন, পরম সভ্য ইংরাজ-রাজও এই কুৎসিৎ কাণ্ড প্রশমিত করিতে বড় প্রয়াস পান না। কামরূপ আসামের মধ্যে সভ্যতার লীলাভূমি, অনেক উন্নতমনা শিক্ষিত লোকেরও বাস, তথাপি এই জাতীয় উৎসবের রঙ্গ-

ভঙ্গী এস্থান হইতে উন্মূলিত হয় নাই;—তবে এখানকার ব্যাপার অপেক্ষাকৃত স্ফূর্ত্তিবিহীন বটে। নওগাঁ, শিবসাগর প্রভৃতি স্থানের কাণ্ড—কল্পনায় আনিতেও ঘৃণা হয়। অবরোধ বিরহিত স্ত্রী-স্বাধীনতাই, বোধ হয়, এই অকথ্য অশ্রাব্য উৎসবের অন্যতম কারণ। বঙ্গীয় পাঠকগণের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য 'বিহু-বিহারে'র মধুর (?) গীতের একটা নমুনা দিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। বলা বাহুল্য, 'বিহু'-গীতোদ্যানের পুষ্পরাশি হইতে আমরা যতদূর পূতি-গন্ধ-শূন্য পুষ্প পাইয়াছি, তাহাই বঙ্গীয় পাঠকের জন্য সংগ্রহ করিয়াছি; পাঠকগণ ইহা হইতেই অন্য পুষ্পের চরম দুর্গন্ধ অনুমান করিয়া লইবেন।—

"চাইনু যে ঠাকিলে হাবিলা ন পলায়—
ন খলে ন গুচে ভোখ।
কিনু সে না হব—
বালি হাতর ব্যাঙনা
দলিয়াই দি যাব মোক?" *

* গীতটী পুরুষের উক্তি রমণীর প্রতি। ঠাকিলে=থাকিলে। হাবিলা=বাসনা। খলে=খাইলে। গুচে=ঘুচে। ভোখ=ক্ষুধা। বালি হাতর ব্যাঙনা=ভাঙ্গাহাটের বেগুণ। দলিয়া=ছুড়িয়া।

অসমা সুন্দরী।

"সুন্দরীগণের চিত্তরঞ্জন করা" 'মালঞ্চে'র * অন্যতম উদ্দেশ্য। বাস্তবিক, মলয়জ-সেবিত সদ্যঃ-কিশলয়-জাত ফুল্ল কুসুম হইতে তৃণ-লতা "শাক-সব্‌জিটী" পর্য্যন্ত 'মালঞ্চে'র যত উপকরণ,—সমস্তই মহিলা-মহলের উপভোগ্য। বালিকার ক্রীড়ায়, যুবতীর কৃষ্ণ-কুন্তল-গুচ্ছ-শোভায়, বৃদ্ধার দেব-সেবায়,—সর্ব্বত্রই কুলবালার নিকট কুসুমের আদর। আর "বীট্-পালম বাঁধা-কপি, কনকরাঙা কড়াইশুঁটী"র আদর পুরমহিলা ভিন্ন অপর কে করিবে? ফলতঃ মহিলাদিগেরই এ 'মালঞ্চ';—মহিলারাই মালঞ্চের।

---

* ভূতপূর্ব্ব 'মালঞ্চ' পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রথম প্রচারিত হয়। কালক্রমে, উপযুক্ত 'সার' অভাবে, 'মালঞ্চ' অকালে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা বড়ই মর্ম্মাহত। 'মালঞ্চে'র সহিত আমাদিগের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, সেই সম্বন্ধের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশে 'মালঞ্চে'র নাম এই প্রবন্ধের সহিত জড়িত রাখিলাম। ভরসা করি, পাঠকবর্গ আমাদিগের এরূপ অনুষ্ঠানে বিরক্ত হইবেন না।

সুন্দরীগণের সন্তোষের জন্যই রসিক সম্পাদক মহাশয় ‘মালঞ্চে’র ‘অঙ্কুরে’ই তাঁহার “হরিণ-নয়নে মেদিনীজয়ী মৈথিলী সুন্দরী”র রূপের পসরা খুলিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয়ের ‘অদৃষ্ট’ সুপ্রসন্ন ;—তিনি “স্বচ্ছ-সলিলা কমলার সৈকতগর্ভে * * * চাঁদের হাট-বাজারে” অগণ্য চাঁদ দেখিয়াছেন, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের বিমল কিরণে—অসামান্য রূপরসে—আপনিও বিভোর হইয়াছেন, ‘মালঞ্চে’র পাঠিকা-পাঠককেও বিভোর করিয়াছেন। আমাদিগের তেমন সৌভাগ্য কৈ ?—তেমন “চাঁদের হাট-বাজারে” যাতায়াত কৈ ?—তেমন চাঁদেরই বা হেথায় উৎপত্তি কৈ ? তাঁহার সুন্দরীদের পার্শ্বে আমাদিগের এ সুন্দরীরা স্থান পাইবেন কি ? ভরসা কিছুই নাই ; তবে এ সুন্দরীরা ‘অসমা-সুন্দরী’*—কেহ সুন্দরী বলুক আর নাই বলুক, আপন সৌন্দর্য্যের গরবে আপনিই উৎফুল্ল ;—ইহাই কেবল একমাত্র ভরসা।

* আসাম দেশের রাজা আহম নামে কথিত। ইহারা আসামের পূর্ব্ববর্ত্তী পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশ হইতে আসামে রাজত্ব করিতে আসেন এবং আসামের রাজ্য স্থাপনের পর এই দেশে তাঁহাদিগের সমকক্ষ কেহ নাই বলিয়া ‘অসম’ নামে অভিহিত হয়েন। কালক্রমে, পূর্ব্বকথিত কারণে (‘বিহু’ প্রবন্ধের টিপ্পনী দেখুন), ‘স’ স্থানে ‘হ’ হইয়া ‘অহম’ বা ‘আহম’ নাম হয়। অনেকে অনুমান করেন, এই “অসম” হইতেই আসামের নামকরণ সাধিত হইয়াছে। আসামের সুন্দরীরা সুতরাং “অসমা সুন্দরী”। ভরসা করি, আমাদিগের এ উদ্ভাবনা নিতান্ত উদ্ভট অনুমিত হইবে না।

"মৈথিলী সুন্দরী"র অবতারণায় 'মালঞ্চ'-সম্পাদক মহাশয় সর্ব্বপ্রকারেই সৌভাগ্যবান্। তিনি মুষ্টিমেয় স্থানের মধ্যে স্বচক্ষে দেখিয়া সমস্ত সুন্দরীর সুন্দর 'ফটোগ্রাফ' তুলিতে পারিয়াছেন। আমাদিগের সুন্দরীরা এক স্থানে স্থায়ী নহেন।* এক স্থানের রূপের কথা বলিলে পাঠক-মহাশয়েরা, অধিকন্তু সুন্দরী পাঠিকাগণ, সমগ্র অসমা-সুন্দরীর সৌন্দর্য্যের সম্যক্ 'এষ্টিমেট' করিতে পারিবেন না। এখানে 'পাহাড়ে' ও 'পাড়াগেঁয়ে' সুন্দরী আছেন, 'হেটো' ও 'মেঠো' সুন্দরী আছেন, অসূর্য্যম্পশ্যা অলোকলাবণ্যাও আছেন। এখানে প্রাণ-ভুলানী মন-মজানী আছেন, গাধা-করুণী ভেড়া-বানানী আছেন, লোলরসনা বিকট-দশনাও আছেন। এখানে বস্ত্র-ভার-প্রপীড়িতা বুট-মোজা-পরিহিতা আছেন, "জঘন উপরে মেখলা" † শোভিতা আছেন, আবার

* আসাম-প্রদেশ একাদশ জেলায় বিভক্ত। তন্মধ্যে তিনটী পর্ব্বতের উপর, দুইটী সুরমানদীর উপত্যকায় এবং ছয়টী ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় অবস্থিত। সুরমা-তীরবর্ত্তী শ্রীহট্ট ও কাছাড় পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল, এখন আসাম-ভুক্ত। পাহাড়ের অধিবাসীদিগের সহিত আচার-ব্যবহারে অন্য কাহারও বড় মিল নাই। ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকা-স্থিত জেলা কয়টীই 'খাস' আসাম বলিয়া পরিচিত। আসামের কোন কথা বলিতে গেলে কিন্তু এই একাদশ জেলার কথাই বলা উচিত।

† সাধারণ অভিধানে 'মেখলা' যে অর্থে গৃহীত হয়, ইহা সে মেখলা নহে। ইহা আসাম-রমণীর প্রধান পরিধেয় বস্ত্র। ইহার আকার ও পরিধান-

দিগ্বসনা দিগম্বরীও আছেন। পরন্তু এখানে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিবর্জ্জিতা ম্লেচ্ছরমণী আছেন, গির্জ্জা-গৃহ সুশোভিনী বাইবেল-বিলোড়নকারিণী খৃষ্টানী আছেন, আবার তিলক-ত্রিপুণ্ড্র-ধারিণী ত্রিকণ্ঠী-দোলনী অন্তঃপুরচারিণী বৈষ্ণবকামিনীও আছেন। অতএব সুন্দরীগণের পৃথক্ পৃথক্ "সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষ" করার পূর্ব্বে একবার তাঁহাদিগের সমভাবগুলি দেখা যাউক। তাঁহারা সকলেই

'পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠী';

কিন্তু সে তাঁহাদিগের স্বভাবজাত সৌন্দর্য্যের আভায় নহে— অবিরাম-চর্ব্বিত তাম্বুল-রাগ-রঞ্জনের প্রভায়। সে তাম্বুল-রাগ-বিলেপনে অনেক সুন্দরীর অধরৌষ্ঠ, 'পক্কবিম্ব' বর্ণ ধারণ না করিয়া* অপক্কবিম্ব, কখনও বা সুপক্কজম্বু'বর্ণ অপেক্ষাও সুন্দর (?) হইয়া দাঁড়ায়। তখন সে 'অধর-প্রান্তে মধুর হাসি,' সে 'মেঘের কোলে সৌদামিনী' খেলিতে

* পদ্ধতি ইংরাজি অভিজ্ঞ পাঠক "Glimpse of Assam"-প্রণেত্রী Mrs. Wardএর কথায় দেখুন,—"The women's costume is a skirt cut like a pillow case, about the same width, open at each end; sometimes they are made of cotton cloth, but usually all classes wear the native silk. The top is drawn tightly around the waist, and a twist of the fold tucked in, keeps it on, without other fastening"

A Glimpse of Assam, Chapter V.

না দেখিয়া আমরা

"রুদ্রবেশী, ব্যোম-কেশী, অট্টহাসি ভীষণা,
দৈত্য-হন্তা, রক্ত-দন্তা, লিহি-লোহ রসনা"—

দর্শনে চমকিত ও আতঙ্কিত হই। তবে, সৌভাগ্যক্রমে, এ সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি "পাহাড়ে সুন্দরী"দিগের মধ্যেই অধিক দ্রষ্টব্য, অন্য স্থলে বিরল। সুন্দরীরা সকলেই 'শ্যামা'। 'শ্যামা'—কিন্তু সকল স্থানে এক অর্থে নহে। ভট্টিকাব্যের কবি বিদেহ-রাজদুহিতা সীতাকে কহিলেন 'শ্যামা'! আমাদিগের চক্ষুঃস্থির;—আমরা পটে-পুতুলে সীতার যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি, সে ত সুবর্ণ-বরণী গৌরাঙ্গী। আর তাহা না হইলেই বা একটা লাঙলে-খোঁড়া মেয়ের জন্য দেশ-বিদেশ হইতে রাজা-রাজড়ারা দুর্জ্জয় 'হরধনুর্ভঙ্গ' করিতে আসিবেন কেন?—মেয়েটার জন্য রামে-রামে রণ-রঙ্গই বা চলিবে কেন? ভাষ্যকার 'শ্যামা'র ব্যাখ্যা করিলেন—

"শীতে সুখোষ্ণ সর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা স্ত্রী শ্যামেতি কথ্যতে॥"

এমন নহিলে শ্যামাঙ্গী? দেখিলে রূপ-রশ্মি-তেজে নয়ন মুগ্ধ হয়, স্পর্শে শীত-গ্রীষ্ম-ভেদে শরীর সময়োপযোগী স্নিগ্ধ হয়। এ রূপের জন্য প্রাণ উন্মাদ হয় বটে, এ রূপের প্রত্যাশায় ছার প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া প্রবল প্রতিদ্বন্দীর সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে বাসনা হয় বটে। "অসমা

সুন্দরী"র মধ্যে অনুসন্ধান করিলে এরূপ শ্যামা দুই-দশটা না মিলে, এমন নহে। বাকী সব—উমা, বামা, রমা, ক্ষেমার মত 'পাঁচ-পাঁচী' শ্যামা ; কেহ কেহ বা একেবারে

"এলোকেশী শ্যামা উমেশ-ঘরণী!"

তবে, বলা বাহুল্য, সকলেই প্রায় 'শ্যামা' বটে।

সুন্দরীদের আর একটা মিল আছে। সেটা কিন্তু রূপের নয়—গুণের। 'মালঞ্চ'-সম্পাদক মহাশয় 'মৈথিলী সুন্দরী'-দিগের রূপ আঁকিয়াই নিরস্ত, গুণ ফলাইতে তত চেষ্টা করেন নাই। আমরা সম্পাদকের উপর 'টেকা দিয়া' এক কাটি উপর যাইতেছি। 'অসমা-সুন্দরী'দিগের দুই-এক মাত্রা গুণের কথাও বলিব। বলিতে ভয় করে; কিন্তু না বলিলেও সুন্দরীরা অসম্পূর্ণা থাকিয়া যান, তাই গোপনে কাণে কাণে বলিতেছি। সুন্দরীরা বড় অতিথিসৎকারনিরতা, মুক্তহস্তা এবং সেবাপরায়ণা ;—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা স্বাধীনা ;—পুরুষের 'পরওয়া' বড় রাখেন না, পূরামাত্রায় 'পর্দ্দানশীন'ও নহেন। অতিথিসৎকারের খাতিরে আশ্রয়াকাঙ্ক্ষী অপরিচিত পুরুষের পদসেবা করিতেও অকুণ্ঠিতা। এই অতিথিসৎকার ও অকাতর পদসেবার গুণে পূর্ব্বে অনেক বঙ্গীয় যুবক আসামে আসিয়া 'ভেড়া' হইয়া থাকিতেন। তখন আসামের পথ বড় দুর্গম ছিল,—একবার কেহ আসিলে সহজে ফিরিতে ইচ্ছা হইত না ; পথের কষ্টে কেহ সপরিবারে আসিতেও বড় একটা

সাহস করিতেন না। তাহার উপর 'অসম্মা-সুন্দরী'র অকৃত্রিম অনুরাগ, অসাধারণ 'তোয়াজ'!—কোন্ পাষণ্ড না তাহাতে 'ভেড়া' হইবে? এখন আর সে ভয় নাই;—পথও সুগম, 'তোয়াজ'ও কম। এখন বঙ্গসুন্দরীরা নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহাদিগের 'বর'কে এই বিদেশে পাঠাইতে পারেন!

এ দেশে এক বিধান শুনা যায়—

"তিরীষু তুরেণ্‌যু করীষু দুষ নাই তে।"*

এটা না-কি মণিপুরী শাস্ত্র। মণিপুর আসামের অন্তর্গত হইলেও, এ শাস্ত্র আসামের সর্ব্বত্র চলে কি না,—আমরা অবগত নহি; কিন্তু শাস্ত্রের ফল অনেক স্থলেই ফলিয়া থাকে,—এরূপ শ্রুত আছি। সৌভাগ্যক্রমে—সৌভাগ্যই বলুন, আর দুর্ভাগ্যই বলুন—এখানে বারবিলাসিনী স্বৈরিণী নাই; সরকারি 'সড়কে'র মাথার উপর ফুলশরধারিণী মায়াবিনীর চটুলনেত্রে চাহনী নাই; আছে কিন্তু প্রবাদ—

"সধবা বিধবা নাস্তি, নাস্তি নারী পতিব্রতা।"

কোন্ বিশ্বনিন্দুক আসাম-বিদ্বেষী এই ঘোর অপবাদ রটাইল,—নির্ণয় করা দুরূহ। তবে 'যেটা রটে, সেটা কতক বটে'—ইহা আমাদিগের বিনম্র বিশ্বাস।

---

* স্ত্রীতে নদীতে কিছুই দোষ নাই(ক)।

'অসমা-সুন্দরী'গণের সমান রূপ-গুণের ব্যাখ্যা ত এই গেল। এখন একবার সকলকে সাধ্যমত পৃথক্ পৃথক্ দেখিতে চেষ্টা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। প্রথম 'পাহাড়ে সুন্দরী'। আসামের সর্ব্বত্রই পাহাড়—

"এ অসম ভূমে যে দিকে চাই,
সে দিকে পাহাড় দেখিতে পাই।"

আসামের এক প্রান্তে বিলাস-বিহ্বল প্রবল নদ ব্রহ্মপুত্র, অপর প্রান্তে শান্তসলিলা সন্তাপহারিণী সুরমা; নদ-নদীর উভয় পার্শ্বে বিমানস্পর্শী শৈলরাজি সদর্পে দণ্ডায়মান। প্রকৃতির এমন সুন্দর বিনোদক্ষেত্র অন্যত্র কদাচ দৃষ্ট হয়। চতুর্দ্দিকে অগণ্য পর্ব্বতশ্রেণী থাকিলেও খাসিয়া-জয়ন্তী, গারো এবং নাগা—এই তিনটাই প্রধান। এই তিন স্থানের রমণী—খাসিয়ানী, গারোণী এবং নাগিনীগণের কথাই আমাদিগের আলোচ্য। এতদ্ভিন্ন মিশ্‌মী, মিকির, কুকী, আকা প্রভৃতি আরও অনেক পার্ব্বতীয়া রমণী আছেন। তাঁহারা সম্প্রদায়ভেদে সামান্যমাত্রায় পৃথক্ প্রতীয়মান হইলেও এই তিন প্রধান শ্রেণীর অন্তর্ভূত। বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ব্যতিরেকে আমাদিগের ন্যায় নগ্ন চক্ষুতে তাঁহাদিগের রূপ-গুণের পার্থক্য পরিচয় করা দুরূহ। শুনা যায়—ডাকিনী, শাঁখিনী, নাগিনী, প্রেতিনী প্রভৃতি বিকট-বরণী রঙ্গিণীরা শৈলেশনাথ সদাশিবের সঙ্গিনী ছিলেন। এ

কালের এই 'পাহাড়ে' সুন্দরীরাই, বোধ হয়, সেকালের সেই শিবানুচরীদিগের বংশধরী। ভগবান ভবানীপতি ভুটিয়া-শৈলে বিহার করিতেন, 'আশ-পাশে'র পাহাড়িনীরা তাঁহার পদসেবা-প্রার্থিনী ছিলেন;—কথা কিছু অপ্রাসঙ্গিক বোধ হয় না। সে কালের শিবসঙ্গিনীদিগের যেরূপ সৌন্দর্য্যের কথা শুনা যায়, এ কালের এই পাহাড়িনীগণের মধ্যেও অনেক স্থলেই সেই পুরাতন মাধুর্য্য অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিভাত দেখা যায়। সেই বিলোলরসনা বিকটদশনা, সেই করালবদনা দিগঙ্গনা *, সেই ভীমরূপা ভয়ঙ্করী, মূর্ত্তি এখনও আমাদিগের আতঙ্ক উদ্দীপন করে। সেই "ধেই-ধেই থেই-থেই" নৃত্য, সেই উন্মাদ-বিহ্বল উদ্ভ্রান্তচিত্ত, সেই 'গলেমে দোলে হাড়েঁকি মালা,' সেই 'পাহাড়ে' পাথরের কঠিন কাণবালা †—সকলই সেই সে-কালের পৈশাচিক কাণ্ড। গারোণী এবং নাগিনীদিগের মধ্যেই এই ভয়াবহ ভাব অধিক দৃষ্ট হয়। খাসিয়ানীরা ইহা-

* গারোণী এবং নাগিনীরা, প্রকৃত প্রস্তাবেই, প্রায় উলঙ্গিনী। যে সামান্য কৌপীন ব্যবহার করে, তাহা কদাচিৎ লজ্জা-নিবারণের উপযুক্ত। কথিত আছে, সংস্কৃত 'নগ্নী' হইতে 'নাগিনী' শব্দের উৎপত্তি; কিন্তু সে সূত্রে 'গারোণী'র উৎপত্তি উদ্ভাবন করা অসম্ভব।

† নাগা এবং গারোদের স্ত্রীলোকেরা, প্রকৃত প্রস্তাবেই, হাড় ও পুঁথির মালা পরে এবং কর্ণের ছিদ্র অতিরিক্ত মাত্রায় বড় করিয়া তন্মধ্যে হাড়ের ও পাথরের গহনা পরিয়া থাকে।

দিগের অপেক্ষা অনেকাংশে রূপসী, বসন ভূষণে চাল-চলনে অনেকাংশে গরীয়সী, বাবুয়ানীর ব্যবস্থায় বাঙ্গালিনীর অপেক্ষাও বিবি-বেশী ;—আবার কেহ কেহ বা সাহেব বাহাদুরদিগের সেবাদাসী। নাগিনীদিগের মধ্যেও আজ-কাল দুই-দশটা মেনকা-উর্ব্বশী মিলে; তাঁহারাও খাসিয়ানী ভগিনীগণের ন্যায় বিবিয়ানী চালে চলিতেছেন। ইহাদিগের ব্যবহারেও সেই হর-মনোমোহিনী কুচ্‌নী-কামিনীগণের কাহিনী মনে হয়। গারোণীদের এই গৌরবের কথা আজও তত অবগত হওয়া যায় নাই।

ইংরাজ-রাজ-প্রসাদাৎ আসাম কয়েকটী জেলায় বিভক্ত এবং তন্মধ্যস্থিত প্রধান প্রধান গ্রামগুলি কিঞ্চিৎ পরিমাণে সহরে পরিণত হইলেও, আসামের সর্ব্বত্রই কৃষিপ্রধান স্থান, সুতরাং 'কল্‌কতইয়া'র চক্ষুতে সেগুলি 'পাড়া গাঁ' ভিন্ন আর কি ?—তথাকার সুন্দরীরাও অগত্যা 'পাড়াগেঁয়ে সুন্দরী'। এ হিসাবে 'পাহাড়ে সুন্দরী' ভিন্ন অপর সর্ব্বত্রই 'পাড়াগেঁয়ে সুন্দরী'। শ্রীহট্ট এবং কাছাড় রমণীরাও আজকাল এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পূর্ব্বে, তাঁহারা পুরা মাত্রায় বাঙ্গালিনী ছিলেন; এখন, রাজার চক্ষুতে 'অসমা' হইলেও, কার্য্যতঃ সেই বাঙ্গালিনীই আছেন। তাঁহাদিগের রূপ গুণের পরিচয় পাইতে হইলে বঙ্গীয় পাঠকগণ আপন আপন গৃহে অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন, এবং সুন্দরী পাঠিকাগণ মুকুরে আত্ম-প্রতিবিম্ব দেখিলেই সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন। বঙ্গসুন্দরীরা

কিন্তু আজ-কাল অনেকেই পটের বিবি, তাঁরা

"মিশি আর লাগান না ঠোঁটে,
আল্‌তা-পরা গেছে উঠে,
বিদ্যুল্লতা সিঁদুর-পাটা নাই আর ললাটে" ;—

এখন সে বয়ান গস্‌নেল-সাবান-বিধৌত, সুগন্ধি-পাউডার-লেপিত, গোলাপ-রাগ-রঞ্জিত ; সে সুন্দর মূর্ত্তি সুরম্য সৌধ-শিখরে 'স্প্রিং-সোফা'পরি কার্পেট-হস্তে অর্দ্ধশয়িত। সে মূর্ত্তি এখন রূপরসান্ধ রসিকের অতৃপ্তনয়নে দেখিবার সামগ্রী—গৃহস্থালীর গণ্ডগোলে 'তস্রূফ' হইবার নহে। শ্রীহট্ট-কাছাড়ের সুন্দরীরা বাঙ্গালিনী হইলেও, তাঁহারা এখনও বঙ্গীয় ভগিনীগণের ন্যায় বিলাস-বিহ্বলা নহেন ; তাঁহারা এখনও সেই সেকালের গৃহিণীগণের ন্যায় অপরূপ কার্য্যকুশলা, আচার-ব্যবহারে অতুলনীয়া সরলা, গৃহধর্ম্ম-প্রতিপালনে অনুক্ষণ চঞ্চলা। তাঁহারা এখনও হিন্দু-অন্তঃপুরের গৃহলক্ষ্মী, হিন্দুর সমাজ-ধর্ম্মে একান্ত পক্ষপাতী। বঙ্গসুন্দরীগণ এজন্য এই পাড়াগেঁয়ে সুন্দরীদিগকে 'অসভ্যা' বলেন—আমরা নাচার।

শ্রীহট্ট-কাছাড়ের কথা উত্থাপন করিতে গেলে মণিপুরের দুই এক কথা না বলিয়া থাকা যায় না। মণিপুর, সাধারণতঃ মিত্ররাজ্য হইলেও, আসামেরই অন্তর্ভূক্ত * ; সুতরাং তথাকার

* মণিপুরের বর্ত্তমান অবস্থা পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ইহার বিশেষ বিবরণ পরিশিষ্টে দেখুন।

সুন্দরীরাও 'অসমা'। বস্তুতঃ আসামের অন্যান্য সুন্দরী-গণের সহিত তুলনাতেও ইহারা অসমা। কিবা মোহন বেশ, কিবা চিকণ কেশ, কিবা চটুল নয়ন, কিবা মৃদুল গমন, কিবা মুখের বরণ, কিবা রূপের কিরণ, কিবা মুকুতানিন্দিত দশন-রাশি, কিবা নধর অধরে মধুর হাসি, কিবা মৃণালনিন্দিত ভুজযুগল, কিবা কমলানিলয় † চরণকমল,—সৌন্দর্য্যের ষোল কলা সুন্দরীদের সর্ব্বাঙ্গে উদ্ভাসিত। আর সর্ব্বোপরি কিবা কোমল ভাব, যেন—

"ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন কোমল মলয়সমীরে!"

অভাবের মধ্যে কেবল—'তিলকুলনাসা'! সুন্দরীদের নাসাগ্র-ভাগ সমুন্নত না হইয়া কিঞ্চিৎ সমতল। পার্ব্বতীয়া রমণী-মাত্রেরই 'নিখুঁত' নাসিকা প্রায় নয়নগোচর হয় না। মণিপুরী 'খাটি' পাহাড়ী না হইলেও, পাহাড়ের পরচালায় তাঁহার বাস, সুতরাং পার্ব্বতীয় ভাবও তাঁহাতে অনেক স্থলে প্রতিফলিত। মণিপুরী সুন্দরীর নাসিকার এই ঈষৎ অস্ফুটতাটুকু না থাকিলে তিনি বাস্তবিক অসমা হইতেন, তাঁহাকে স্বর্গের

† গীত-গোবিন্দ—৭ম সর্গ, ১৫শ গীত। জয়দেব-কবির দোহাই দিয়া আমরা এই কথা ব্যবহার করিলাম। জয়দেব কবি কোন্ সাহসে শ্রীরাধিকা ভিন্ন অপর কামিনীর "চরণ-কিশলয় কমলা-নিলয়" বলিলেন, বলিতে পারি না; তবে মণিপুরী সুন্দরীরা সকলেই কৃষ্ণ-প্রেমানুরাগিনী এবং স্ত্রীলোক-মাত্রেই লক্ষ্মীস্বরূপিনী;—আমাদিগের কেবল ইহাতেই সাহস।

অপ্সরা বলিয়া ভ্রম জন্মিত। তবে নাসিকার এই 'খুঁত'টুকু নষ্ট হইয়াছে—সুন্দরীদিগের তিলকের গুণে। সুন্দরীরা সকলেই বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবকেতন তিলকও প্রত্যেকের নাসাগ্রে অঙ্কিত। এই তিলক-রেখা নাসিকার নত ভাবকে সমুন্নত করে, সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভ্রান্ত পথিকের প্রণয়াকাঙ্ক্ষা উদ্দীপন করে। বৈষ্ণবসুলভ অনেক সদ্গুণই ইহাদিগের মধ্যে পাওয়া যায়। ব্রজাঙ্গনারা যেরূপ আপনা ভুলিয়া রাস-রসিক শ্রীকৃষ্ণের পাদ-পদ্মে আত্মমনঃপ্রাণ সমর্পণ করিতেন, মধুর হরিনামের তরঙ্গ তুলিলে ইহারাও সেইরূপ আত্ম-বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণপ্রেম-বিতরকের অগাধ প্রেম-তরঙ্গে নিষ্কামভাবে ডুবিয়া যান!

শেষ কথা—'খাটি' অসমা সুন্দরীদিগের। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাস্থিত ছয়টী জেলাই প্রকৃত আসাম (Assam Proper); এবং তথাকার সুন্দরীরাই সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে 'অসমা' নামের উপযুক্ত। রূপের তুলনায় ইহারা বাঙ্গালিনীর পার্শ্বে বসিতে পারেন,—বর্ণের 'জলুশ' বরং স্থল-বিশেষে বেশী বেশী। 'গড়ন পিটুনে' বঙ্গসুন্দরীদিগকে ইহাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে গরীয়সী বোধ হয় না; কিন্তু বঙ্গসুন্দরীদিগের কেমন একটু স্বভাবজাত সৌকুমার্য্য, কেমন একটু মধুর মোহন মূর্ত্তি, কি-জানি-কেমন একটু কোমল ভাব,—তাহা ব্রজাঙ্গনাতেও নাই, তৈলঙ্গিনীতেও নাই, মাগধীতেও নাই, মৈথিলীতেও নাই, আর এখানকার এই অলোকসামান্যা অসমা-সুন্দরীদিগের মধ্যেও নাই। বঙ্গ-

মহিলার এই অসাধারণ রূপমাধুরী একদেশদর্শিতা দোষে কেবল বঙ্গীয় লেখকের চক্ষুতেই প্রতিভাত হয়, কিম্বা ইহা তাঁহাদিগের সর্ব্ববাদিসম্মত নিজস্ব সম্পত্তি,—ইহা সহৃদয় পাঠকবর্গের বিবেচ্য। বঙ্গসুন্দরীরা এক বিষয়ে কিন্তু সকলের নিকটেই হীন;—এটী তাঁহাদিগের পরিধেয় বস্ত্র। নবীনারা নিতান্ত পক্ষে 'নীলাম্বরী' পছন্দ না করিলেও, শান্তিপুরের সুন্দর সাটী এখনও তাঁহাদিগের 'সরম' নিবারণ করে। কেহ কেহ আজকাল এক একটা 'আলখাল্লা' পরিধান করেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদিগের স্বভাবসৌন্দর্য্যটুকু বিনষ্ট করে, ডিপ্লোমা-ধারিণী ধাত্রীঠাকুরাণী বলিয়াই তাঁহাদিগকে ভ্রম জন্মে। এ সম্বন্ধে আসামের পর্ব্বতচারিণী খাসিয়ানীগণও তাঁহাদিগের অপেক্ষা উন্নত। ভদ্রসংসারে অসমা-সুন্দরী-গণের কটিতে 'মেখলা', বক্ষে 'বুড়ি' (এটা কিন্তু কিঞ্চিৎ 'ইদানীং'-দলেই দেখা যায়), গাত্রে 'রিহা', মস্তকে 'ওড়না'। সুতরাং বঙ্গীয়া ভগিনীগণের তুলনায় তাঁহাদিগকে দেখিতে অনেকটা সভ্যা-ভব্যা। ইতর এবং অর্থহীন শ্রেণীর মধ্যে এক মেখলাই সকল অভিপ্রায় সম্পন্ন করে এবং কাজেই সুন্দরীগণকে অর্দ্ধদিগম্বরী করিয়া তুলে, কিন্তু এটা সাধারণ নিয়মের অধীন নহে।

বঙ্গসুন্দরীরা 'কূপ-মণ্ডূক;—তাঁহাদিগের 'নথ-নাড়া ঝাল-ঝাড়া' অন্তঃপুর-প্রকোষ্ঠের মধ্যেই নিবদ্ধ, প্রকোষ্ঠের বাহিরে তাঁহাদিগের বড় 'বাহাদুরী' খাটে না। অসমা-

সুন্দরীরা সে পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যবতী। 'হাটে, ঘাটে, মাঠে, বাটে,'—সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের গতিবিধি; সর্ব্বস্থানেই তাঁহারা কর্ত্রী। 'অসমিয়া মানু' 'কাণি'র * প্রকোপে বিভোর হইয়া থাকেন,—উৎসাহ-উদ্যম-শূন্য, উল্লাস-উন্মেষ-বিহীন, উত্থান-শক্তি-রহিত;—সুন্দরীরা কাজেই সংসারের সকল কাজ করেন,—পুরুষের কর্ত্তব্য পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে পুরামাত্রায় করিতে হয়। পুরুষ কোনগতিকে ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত, অবশিষ্ট সমস্ত কার্য্যের ভার সুন্দরীদিগের হস্তে। হাট-বাজার করা, অতিথি-অভ্যাগতের খবর লওয়া, প্রভৃতি গৃহস্থালীর অন্যান্য অঙ্গ ত তাঁহাদিগের 'একচেটিয়া'। কামরূপ এবং অন্যান্য সুসভ্যস্থানের ভদ্র পরিবার মধ্যে এ ভাবের ক্রমশঃ তিরোভাব হইতেছে সত্য, কিন্তু পুরুষের উপর স্ত্রীজাতির প্রাধান্য আসামের অনেক স্থলেই আজ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

'অসমা-সুন্দরী'দিগের একটী প্রধান গুণ—তাঁহাদিগের শিল্প-নৈপুণ্য। বঙ্গগৃহের নবীনাগণ নবনীনিন্দিত কোমলহস্তে কার্পেটের কারুকার্য্যই কেবল আজকাল দেখাইতে পারেন, সেকালের গৃহিণীগণের ন্যায় গৃহস্থালীর উপযোগী দ্রব্যজাত তাঁহাদিগের হস্ত হইতে বড় বাহির হয় না। অসমা নবীনাগণ এখনও ততদূর উন্নত (!) হইতে পারেন নাই;—সংসারের

* মানু-(বা-মানুহ)=মানুষ, মনুষ্য, পুরুষ। কাণি=অহিফেন, আফিম।

সর্ব্বোচ্চ প্রয়োজনীয় সামগ্রী—বস্ত্রও তাঁহারা প্রস্তুত করেন। মাথায় ঘোমটা টানিবার জন্য 'অসমা-সুন্দরী'কে এখনও বড় ম্যাঞ্চেষ্টারের নিকট মস্তক অবনত করিতে হয় না, কলের কাপড়ের কারখানা তাঁহারা এখনও বড় বুঝেন না। সূত্রবস্ত্র ব্যতীত ভাল রেশমী কাপড়ও তাঁহারা স্বহস্তে প্রস্তুত করেন; মুগা, এড়ি প্রভৃতি আসাম-জাত রেশমী বস্ত্র, তুলনায় তসর-গরদ অপেক্ষা কিছু হীন হইলেও, স্বাধীন শিল্পের অতি সুন্দর নিদর্শন, এবং ইহার উৎকৃষ্ট ভাগই 'অসমা-সুন্দরী'-গণের হস্ত-প্রসূত।



অসমীয়া কি স্বতন্ত্র ভাষা ?

“যোজনান্তে পৃথক্ ভাষা”—পূর্ব্বাপর প্রচলিত এ প্রবাদ বাক্যের সার্থকতা আমরা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। রেলযোগে কলিকাতা হইতে দিল্লী যাত্রা কালে এই ভাষার ক্রমভেদ কেমন অলক্ষ্যে উদ্গত হয়, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরের ভাষাগত পার্থক্য ত দূরের কথা, এক জেলার মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়,—গঙ্গাতীরবর্ত্তী লোকদিগের সহিত কিঞ্চিদ্দূরবর্ত্তী লোকের কথার তুলনা করিলেই ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইতে পারে। স্থানের দূরতা অনুসারে ভাষাগত বিভিন্নতা বাড়িতে থাকে ;—কলিকাতার কথার সহিত বাঁকুড়া-বীরভূম বা শ্রীহট্ট-চট্টগ্রামের গ্রাম্য কথা তুলনা করিলে পরস্পর এত পার্থক্য দেখা যায় যে, তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলিলেও অত্যুক্তি বোধ হয় না। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মধ্যে মনুষ্যের এই ভাষা-বৈচিত্র্যও অদ্ভুত

রহস্যময়; জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ও এ রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ কি না, সন্দেহ। অসমর্থ হইলেও, মনুষ্যের চেষ্টা ও উদ্ভাবনী শক্তি সুদূরপ্রসারিণী—এই ভাষাভেদের একটা হেতু নিরূপণেও মনুষ্য-চেষ্টা নিতান্ত ব্যর্থ হয় নাই। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ নানারূপ গবেষণা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—দুরারোহ গিরিশ্রেণী, দুর্লঙ্ঘ্য সাগরমালা, প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যবচ্ছেদই এই ভাষাভেদের প্রধান হেতু।* কথা অযৌক্তিক নহে,—ভারতে এইরূপ প্রাকৃতিক ব্যবচ্ছেদ অধিক বলিয়াই ভাষাগত পার্থক্যও প্রভূত।

ভারতে নানা ভাষা ও উপভাষা বর্ত্তমান থাকিলেও, সংস্কৃতমূলক হিন্দী, বাঙ্গালা, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী, পালী ও সিংহলী—এই কয়েকটী আর্য্যভাষার প্রধান শাখা বলিয়া পরিগণিত। অধুনা, অনেক পণ্ডিত এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন ভাব সংস্থাপনে যত্নবান হইয়াছেন। অন্য দেশের কথা ধরি না—আমাদিগের বাঙ্গা-

---

* পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় উদাহৃতবৃত্ত বৃহন্মনুবচন দ্বারা এই কথাই প্রতিপাদন করিয়াছেন—

"বাচো যত্র বিভিদ্যন্তে গিরির্বা ব্যবধায়কঃ।
মহানদ্যন্তরং যত্র তদ্দেশান্তরমুচ্যতে॥"

পরিবর্ত্তিত আকারে উহা পাঠ করিলেই পাওয়া যায়—গিরি বা মহানদীর ব্যবধান-ভূত দেশান্তরেই ভাষার বিভিন্নতা হইয়া থাকে।

লার অন্তর্গত উড়িয়া ও অসমীয়া ভাষা এখন পৃথক্ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এ দুইটাকে স্বতন্ত্ররূপে স্বীকার করিতেছেন। প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল, পুরাতত্ত্ববিদ্ সুপণ্ডিত স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় এবং বালেশ্বর সরকারী বিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষক কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় উড়িয়া ও বাঙ্গালা ভাষার স্বাতন্ত্র্য অপনোদনে যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, সম্প্রতি, আসামী ভাষায় লিখিত "জোনাকী" নামক সাময়িক পত্রে "অসমীয়া ভাষার উন্নতি সাধিনী সভা"র সম্পাদক, ধীমান শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়, বাঙ্গালা ও আসামী ভাষার স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদনে ততোধিক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে তৎপ্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বাঙ্গালা বা অসমীয়া—কোন ভাষাতেই আমাদিগের অভিজ্ঞতা নাই; এরূপ অবস্থায় এই গুরুতর বিষয়ে বাক্যব্যয় করা আমাদিগের পক্ষে বাতুলতা মাত্র। তবে, বহুদিন আসাম-প্রবাসের স্মৃতির সহিত এই উভয় ভাষার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সংজড়িত, সেই স্মৃতির কুহকেই দুই এক কথা কহিতেছি—ভরসা করি, সহৃদয় অসমীয়া বন্ধুগণ আমাদিগের এই ধৃষ্টতা উপেক্ষা করিবেন।

বঙ্গভাষার সৃষ্টিকালে কতদূর পর্য্যন্ত উহার প্রসার ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। বর্ত্তমান কালে ভাষাগত

যে কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, উত্তরে হিমালয়-তল-দেশ, পশ্চিমে মিথিলা, দক্ষিণে উড়িষ্যা এবং পূর্ব্বে আসাম—এই চতুঃসীমার মধ্যে প্রথমতঃ বঙ্গভাষার বসতি-স্থান ছিল। হিমালয় সন্নিহিত রঙ্গপুর দিনাজপুর আজ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ বলিয়া পরিচিত এবং বঙ্গভাষাই তথায় কথিত হইয়া থাকে; মিথিলার অন্যতর রাজধানী, "দ্বারভাঙ্গা, দ্বার-বঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ" এবং "সেনরাজদিগের বঙ্গরাজ্যের পশ্চিমদ্বার বলিয়া" নির্দ্দিষ্ট। * বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার এক ভাষা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে; আসামীও এতকাল বাঙ্গালা ভাষার রূপান্তর মাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং বাঙ্গালার হতাদর ও অসমীয়ার স্বাতন্ত্র্য স্থাপন অকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। † কালসহ-

---

* শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় সম্পাদিত "বিদ্যাপতির পদাবলী" গ্রন্থে ভনিখিত উপক্রমণিকার ১০ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখুন।

† "A few years ago it was the fashion for Government officials to assert that Assamese was only a corrupt and vulgar dialect of Bengali, a *patois* bearing to it the same relation which Yorkshire bears to the literary English, and that it ought in no way to be encouraged, but to be crushed out as quickly as possible, by using Bengali as the official tongue and teaching it in schools."—*—Extract from a quotation from the Census Report of 1881, in para. 160, Chap. VIII, Part II, Vol. I, of the Census of Assam, 1891.*

কারে, স্থান সমূহের নিত্য নব কৃত্রিম বিভাগানুসারে, ভাষারও রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। মিথিলা ও বঙ্গদেশ পূর্ব্বে এক রাজ্যভুক্ত ছিল, তাই মৈথিল কবি বিদ্যাপতির 'প্রেমময় পদ সমূহ' আজি পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য সম্পত্তি বলিয়া আমরা স্পর্দ্ধা করিতে পারি। এখন মিথিলা ও বঙ্গদেশ পৃথক্ হওয়ায়, বিদ্যাপতির বাসস্থান লইয়া বিলক্ষণ বিবাদ উপস্থিত হয়—তাঁহাকে অবিমিশ্র বঙ্গবাসী প্রতিপন্ন করিবার জন্য, বিদ্যাপতির ও চণ্ডীদাসের তৎকালীন সৌহৃদ্য এবং উভয়ের কাব্যগত সৌসাদৃশ্য সূত্রে, বাঁকুড়া বা বীরভূমে তাঁহার বাসস্থান নির্ণীত হইয়া থাকে। * ইদানীং

সুবিখ্যাত হাণ্টার সাহেবও ঐ কথাই বলিয়াছেন—

There is no single Assamese nationality, the Assamese language is merely a modern dialect of Bengali.—*Imperial Gazetteer of India, Vol I. page 351.*

* পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য" বিষয়ক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন, "চণ্ডীদাসের বাটী বীরভূম জেলার মধ্যে ছিল। তাঁহার সহিত বিদ্যাপতির সাক্ষাৎকার বর্ণিত আছে। তদনুসারে বীরভূমির সন্নিহিত কোন স্থানেই বিদ্যাপতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত বোধ হয় না। * * বিষ্ণুপুরস্থ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষক মহাশয় * * লোক পরম্পরায় জানিতে পারিয়াছেন যে, বাঁকুড়া জেলার ছাৎনা প্রদেশে বিদ্যাপতির বাস ছিল। তিনি ঐ প্রদেশের এক সামান্য রাজা শিবসিংহের সভাসদ্ ছিলেন।" পক্ষান্তরে, উল্লিখিত মনস্বী সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তৎসম্পাদিত "বিদ্যাপতির পদাবলী" গ্রন্থের

মিশনারী মহাশয়গণের মন্ত্রণায় ও স্বদেশবৎসল জন কয়েক অসমীয়া বন্ধুর চেষ্টায় আসামের ভাষাও পৃথক্ বলিয়া পরিচিত হইতেছে। এই পার্থক্য প্রচলন কতদূর ন্যায়ানুমোদিত এবং স্বদেশের সুমঙ্গল সাধক, এখন তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

'জোনাকী'র উল্লিখিত প্রবন্ধ লেখক অসমীয়া ভাষার, প্রধানতঃ, তিনটী যুগ নিরূপণ করিয়াছেন ;—অসমীয়া ভাষার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা ৺শঙ্করদেবের জন্মের প্রাক্‌কাল প্রথম যুগ, শঙ্করদেবের জন্মের পর ইংরাজরাজ কর্ত্তৃক আসাম-অধিকার-

---

উপক্রমণিকায় নানা ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন, "মিথিলা অর্থাৎ দ্বারভাঙ্গা প্রদেশও যবন কবলস্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তত্রস্থ সমস্ত রাজকার্য্য হিন্দুরাজগণের হস্তগত ছিল। * * তন্মধ্যে ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিথিলায় এক বংশীয় ব্রাহ্মণ রাজত্ব করেন ; এবং তদ্বংশীয় তৃতীয় রাজা শিবসিংহ ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিন বৎসর নয় মাস সিংহাসন অধিকার করেন। * * বিদ্যাপতি এই যশোবন্ত নৃপতির সভাসদ্ ছিলেন। * * * চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমকালবর্ত্তী ছিলেন এবং তিনিও বিদ্যাপতির ন্যায় কৃষ্ণলীলা-সঙ্কীর্ত্তন-রচনা দ্বারা খ্যাতিলাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। উভয়ে উভয়ের যশঃসৌরভে মোহিত হইয়া পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। * * প্রবাদ আছে যে ভাগীরথী তীরেই কবিদ্বয়ের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। চণ্ডীদাস বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে বাস করিতেন ; এই জন্য পূর্ব্বে আমাদের সংস্কার ছিল যে, বিদ্যাপতিও বীরভূম বা বাঁকুড়া জেলায় বাস করিতেন।

কাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যুগ, এবং ইংরেজাধিকারের সূত্র হইতে আজি পর্য্যন্ত তৃতীয় যুগ। এই যুগত্রয়-বিভাগে আমাদিগেরও বিশেষ মতভেদ নাই; তবে, প্রথম যুগের অব্যবহিত পরেই দ্বিতীয় যুগের অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল কি না এবং প্রথম যুগের ভাষাই পরিমার্জ্জিত হইয়া দ্বিতীয় যুগের ভাষায় পরিণত হইয়াছিল কি না—এতৎপক্ষে আমাদিগের ঘোর সন্দেহ, এবং সে সন্দেহ অপনোদনে গোস্বামী মহাশয় বিশেষ সফলকাম হইয়াছেন বলিয়াও বোধ হয় না। হিন্দুগণের আধিপত্য-কালে ভগদত্ত, নরকাসুর প্রভৃতি নৃপতিবর্গের কীর্ত্তির কথা কাহারও অবিদিত নাই; প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের প্রসিদ্ধি এবং তৎকালীন সংস্কৃত ভাষার প্রচলন বিষয়েও মতদ্বৈধ সম্ভবে না। এই অবস্থা বর্ণন প্রসঙ্গেই গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"যিবিলাক আর্য্যই কামরূপত ঘৰ বাড়ী লৈছিল, প্ৰথমতে সংস্কৃতেই তেঁওবিলাকৰ ভাষা থাকিলেও, সময়ৰ লগে লগে তেঁওবিলাকৰ মাতৃ-বোলেও পুৰুষে পুৰুষে অল্প লৰচৰ হৈ গঢ় লবাবলৈ ধৰিলে; তাত বাজেও অনাৰ্য্য-জাতিবিলাকৰ ভাষায়ো তেঁওবিলাকৰ ভাষাক আক্ৰমণ কৰিছিল; এই বোৰ কাৰণত তেঁওবিলাকৰ ভাষা সংস্কৃতৰ পৰা বহুত আঁতৰ হৈ হৈ অন্তত অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম হল।"

পৌরাণিক যুগে 'আসাম' নামে কোন জনপদ ছিল না, সুতরাং তৎকালে 'অসমীয়া' ভাষার উৎপত্তি হইতেই পারে না। 'অসমীয়া'শব্দ 'অসম' আর 'অসম' শব্দ 'আহম'শব্দ

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—একথা গোস্বামী মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন ; অতএব আহমদিগের রাজত্বকালেই অসমীয়া ভাষার সৃষ্টি ঘটে, ইহা অস্বীকার করা অসঙ্গত বোধ হয়। "অসমীয়া ভাষা আহম জাতির ভাষা বা সিবিলাকৰ ভাষার পৰা ওলোৱা এটা ভাষা ন হয়"—একথা সম্পূর্ণ সত্য বটে ; কিন্তু ঐ ভাষা যে আহম রাজার রাজত্বকালে সৃষ্ট নহে, তাহার যুক্তিযুক্ত প্রমাণ কোথা ? প্রত্যুত, আহম রাজত্বকালেই বর্ত্তমান অসমীয়া ভাষা সংগঠিত হয়—'জোনাকী'র প্রবন্ধ পাঠে এইরূপই প্রতীতি জন্মে। আর্য্যনৃপতিকুলের তিরোধানের পর আসামে ঘোর অরাজকতা এবং অনার্য্য বর্ব্বরজাতির প্রাদুর্ভাব ঘটে ; এই অরাজকতার সময়ে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের আদিম বাসীগণের বংশপরম্পরা একরূপ নির্ম্মূল হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে তৎকথিত ভাষারও মহাবিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। এরূপ অবস্থায়, অনার্য্য ভাষার সংক্রমণে আর্য্য সংস্কৃত ভাষাই অসমীয়া ভাষায় পরিণত হওয়া সমীচীন বোধ হয় না ; বরং বহুকাল ব্যাপী অনার্য্যজাতির সংঘর্ষে মূল ভাষা একরূপ উৎসন্ন হইয়া অনার্য্য ভাষাতেই পরিণত হইয়াছিল বোধ হয়। আর্য্যজাতির প্রভুত্বকালে কামরূপ যেরূপ সমৃদ্ধিশালী জনপদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, অনার্য্যজাতির প্রাদুর্ভাব সময়ে সে সমৃদ্ধির কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না, বরং বর্ব্বরের রাজ্য কেবল বন-জঙ্গলেই ব্যাপ্ত ছিল—ইহারই লক্ষণ দেখা যায় ; এই অবস্থায়

ভাষা-গঠন কোন মতেই সম্ভবে না। প্রত্যুত, আহমগণের শুভাগমনেই আসামের নবজীবন সঞ্চারিত হয়, শ্মশানের প্রেতভূমি অপরূপ রাজসদনে পরিণত হয়, ঘোর অমান্ধকারের পর চন্দ্রকিরণ প্রতিভাত হয়;—পুরাতন বিস্মৃতির অন্তরালে বিলুপ্ত হইয়া, এই সময়ে এক নবীন রাজ্য সংগঠিত হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান যুগে আসামের প্রাচীন সমৃদ্ধির যে কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই ঐ আহম রাজাদিগের কৃত; সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য, সম্পদ ও সভ্যতার সহিত ভাষা সৃষ্টিরও প্রয়োজন ঘটে, এই অবস্থায় অমানুষী প্রতিভাসম্পন্ন শঙ্করদেব আবির্ভূত হয়েন, এবং তাঁহারই প্রসাদে নূতন 'অসমীয়া' ভাষা সৃষ্ট হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

ধর্ম্মরাজ্যে ঘোর অরাজকতার পর মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়া নব ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন এবং মধুর হরিনামের রোল তুলিয়া পাপী-তাপীর পরিত্রাণ সাধন করেন। অনার্য্যজাতি সমাগমে আসামে লৌকিক অরাজকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিক বিষয়েও ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। আহম রাজার অভ্যুত্থানে বাহ্য সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক অধোগতির

তখনও নিরসন ঘটে নাই; এই অধোগতি দূর করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনের উদ্দেশেই মহানুভব শঙ্করদেবের আবির্ভাব বোধ হয়। শঙ্করদেব চৈতন্যদেবের সমসাময়িক—অথবা চৈতন্যদেবই শঙ্করদেবের সময়ে নবদ্বীপ ধামে প্রাদুর্ভূত হয়েন; শ্রীচৈতন্যের জন্মের ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাঁহার তিরোধানের ৩৬ বৎসর পরে মানবলীলা সম্বরণ করেন; মহাপ্রভু ৪৮ বৎসর মাত্র মর্ত্ত্যলীলা করিয়াছিলেন; * অতএব, দেখা যায়, শঙ্করদেব কলিযুগের পূর্ণ পরমায়ু সম্ভোগ করিয়া শাস্ত্রের বচন সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। প্রতিভাশালী পুরুষের প্রথমাবস্থা হইতেই বুদ্ধি ও মহত্ত্বের লক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়; স্বজাতিপ্রেম ও স্বধর্ম্মানুরাগ শঙ্করদেবের শৈশবাবধি অন্তরে জাগরূক ছিল, তিনি প্রথমতঃ স্বদেশেই যথাসম্ভব বিদ্যানুশীলন ও ধর্ম্মচর্চ্চা করেন, পরে তাহাতে সম্যক্ তৃপ্তি না হওয়ায় জ্ঞানার্জ্জনোদ্দেশে বঙ্গদেশে গমন করেন। বাঙ্গালার তখন বিলক্ষণ উন্নত অবস্থা; এক দিকে শ্রীচৈতন্য হরিপ্রেম বিতরণে মাতুয়ারা, অন্য দিকে রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী, গোপালভট্ট, কর্ণপূর প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যগণ বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থরচনায় তৎপর, অধিকন্তু অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি

* চৈতন্যদেবের অবস্থান-কাল ১৪০৭ শক হইতে ১৪৫৫ শক পর্য্যন্ত।
৺শঙ্করদেবের অবস্থান-কাল ১৩৭১ শক হইতে ১৪৯১ শক পর্য্যন্ত।

এবং স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের নব-জীবন সংসাধনে সম্পূর্ণ সফলকাম। বাঙ্গালা ভাষারও, প্রকৃত প্রস্তাবে, ইহাই উৎপত্তিকাল; ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী ভিন্ন বঙ্গভাষায় লিখিত উল্লেখযোগ্য অপর কোন গ্রন্থই ছিল না, এখন চৈতন্য শিষ্যগণ তদীয় ধর্ম্মপ্রণালী সাধারণের গোচর করিবার নিমিত্ত চলিত ভাষা বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। † এই শুভ সন্ধিক্ষণে স্বর্গীয় শঙ্করদেব বঙ্গদেশে উপনীত হইয়া অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। বহুদিন বঙ্গদেশে অবস্থান করায় ও বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্মের আলোচনায় তৎকালীন প্রচলিত বঙ্গভাষা একরূপ তাঁহার নিজস্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, লোক শিক্ষা-বিস্তারের নিমিত্ত ভাষা-সংগঠন নিতান্ত আবশ্যক—ইহাও তাঁহার সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছিল; তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক চিরপোষিত হৃদয়ের ভাব কার্য্যে পরিণত করিতে বদ্ধ-পরিকর হইলেন, এবং অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য বলে অচিরেই নূতন ভাষায় পুস্তক প্রণয়ন ও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে কৃতার্থতা লাভ করিলেন। ইহার আচার-ব্যবহার এবং পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মপ্রচার শীঘ্রই তদানীন্তন আহম রাজার

† পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব।"—৫৪।৫৫ পৃষ্ঠা।

চিত্তাকর্ষণ করিল, এবং বঙ্গদেশই তাঁহার এই সমস্ত গুণ-গ্রামের মূল বুঝিয়া তথাকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রতি সহজেই ভক্তি সঞ্চারিত হইল; রাজা অনতিবিলম্বেই ৺শঙ্করদেবের নির্ব্বাচিত চারিজন সুপণ্ডিত ও সদ্‌ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশ হইতে আনয়ন পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। তদবধি আসামে হিন্দুধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব; ঐ ব্রাহ্মণ চতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ-পাট, কূরবাহী, গরমুর এবং আউনীহাটী নামক চারিটী প্রধান সত্র আজি পর্য্যন্ত অসমীয়া হিন্দু সন্তানের হৃদয়ে ধর্ম্মবারি সিঞ্চনে নিযুক্ত রহিয়াছে, এবং ৺শঙ্করদেব প্রতিষ্ঠিত ভাষা আজি পর্য্যন্ত 'অসমীয়া ভাষা' বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। এই সকল তথ্যের অধিকাংশই আমরা আলোচ্য প্রবন্ধ হইতে শিক্ষা পাই, কেবল বাঙ্গালার সহিত অসমীয়ার সম্বন্ধ ঘুচাই-বার উদ্দেশ্যেই, বোধ হয়, প্রবন্ধ-লেখক গোস্বামী মহাশয় দেশের উল্লেখ না করিয়া কেবল ৺শঙ্করদেব "জ্ঞান অর্জ্জিবৰ নিমিত্তে বিদেশলৈ যায়"—এই কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার যে উদ্দেশ্যই হউক, শঙ্করদেবের জ্ঞানোপার্জ্জনার্থ বঙ্গদেশে যাও-য়ার কথা আমরা পরিচিত অনেক অসমীয়া বন্ধুর মুখেই শুনিতে পাই। এখন তাঁহার গঠিত ভাষাই প্রকৃত 'অসমীয়া' নামের যোগ্য কি না, এবং বঙ্গভাষাই উহার প্রাণ কি না, ইহা বুদ্ধিমান পাঠকবর্গের বিবেচনাধীন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ৺শঙ্করদেব যে সময়ে বঙ্গদেশে গমন করেন, বঙ্গভাষা সেই সময়ে নব কলেবরে গঠিত হইতেছিল,

—তৎপূর্ব্বে কেবল বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী বঙ্গ-সাহিত্যের পরিচয় প্রদান করিত। ঐ দুই বিখ্যাত কবির মধ্যে বিদ্যাপতির রচনাতেই অধিকতর লালিত্য ও মধুরতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগে বঙ্গসাহিত্য-সেবকমাত্রেই যেরূপ স্বর্গীয় বঙ্কিম চন্দ্রের আদর্শে, ন্যূনাধিক, নিজ রচনার লালিত্য বর্দ্ধনে চেষ্টা করিয়া থাকেন, শ্রীচৈতন্য ও শঙ্কর-দেবের সময়ে সেইরূপ লেখক মাত্রেই বিদ্যাপতির ছাঁচে আপন রচনা গঠন করিতে যত্ন করিতেন। "তাঁহারই আদর্শ লইয়া গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস, নরোত্তম দাস, জ্ঞান-দাস, শ্রীনিবাস ও নরহরিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ পদরচনা করিয়া স্ব স্ব নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।" শঙ্করদেব বঙ্গদেশে অবস্থান কালে তৎকালীন বঙ্গভাষার গঠন-পদ্ধতি শিক্ষা করায়, তাঁহার "লেখাও অনেক অংশে, তেঁওবিলাকব (বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের) লেখাবে সৈতে মিলে।" জোনাকীর প্রবন্ধ-লেখক বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস এবং শঙ্করদেবের কবিতাখণ্ড উদ্ধৃত করিয়া স্বয়ং এ কথা প্রতিপাদন করিয়াছেন, অতএব তৎসম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় করা অনাবশ্যক। দুঃখের বিষয়, এ সূত্রেও বঙ্গ-ভাষার সহিত 'অসমীয়া ভাষা'র ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের কথা গোস্বামী মহাশয় কৌশলে লোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ৺শঙ্কর-দেবের নাটকাদিতে মৈথিল ও উড়িয়া কথার ব্যবহার নিরূপণে গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"মানুহে বিদেশী মাত শুনিবলৈ বেছি ভাল পায়; আমার কাণত বাঙ্গালী কথা যিমান মিঠা লাগে, আরু বাঙ্গালীৰ কাণত অসমীয়া মাত যিমান মিঠা লাগে, আপোন ভাষা সদাই কৈ থাকা বাবে সিমান মিঠা না লাগে; সেই বাবেই বিদেশী ভাষাৰ ভাঁজ দি তেঁও নাট আদি লেখিছিল।"

এ অতি আশ্চর্য্য যুক্তি! কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস ও সেক্ষ-পীয়রের নাটক সমূহে ভাষার মিষ্টতা বৃদ্ধির জন্য বিদেশী "ভাঁজ' মিলাইবার চেষ্টা দেখা যায় না, বরং রমণী ও ইতর শ্রেণীস্থ লোকের কথায় প্রাকৃত বা provincialismএর অবতারণা দেখা যায়। নাটক-নামধেয় বাঙ্গালার বর্ত্তমান কোন গ্রন্থেও বিদেশী বাক্য ব্যবহৃত হয় না, বরং স্বদেশের সরল কথাই যথাসম্ভব ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রত্যুত, শঙ্করদেবের সময়ে মিথিলা ও উড়িষ্যা বঙ্গদেশভুক্ত ছিল, ঐ সমস্ত প্রদেশের কথাও বঙ্গভাষার অঙ্গভূত ছিল—সুতরাং শিক্ষা ও সংশ্রব গুণে ঐ সকল স্থানের কথা তাঁহার রচিত গ্রন্থে সহজেই প্রবিষ্ট হইয়াছে।

অতঃপর বর্ত্তমান যুগের কথা। ইংরাজ শাসনাধিকার-কালই বর্ত্তমান যুগ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে; অসমীয়া ভাষাকে বর্ত্তমান ছাঁচে ঢালা ও উহাকে পৃথক্ ভাষা বলিয়া পরিচয় দেওয়া এই শেষ যুগেই ঘটিয়াছে। 'জোনাকী'র প্রবন্ধলেখকগণ এবং তাঁহাদিগের সহযোগীবর্গই বর্ত্তমান যুগের লেখক-সমাজের ও ভাষাস্রষ্টার শীর্ষস্থানীয়। শিক্ষাগুণে স্বদেশীয় ভাষার স্বাতন্ত্র্য সাধনে সচেষ্ট হইলেও, ইহাদিগের

ভাষার আদিতেও বাঙ্গালা ভিন্ন অপর কিছু দেখা যায় না। ইংরাজের শুভাগমনের সঙ্গেই তদীয় পার্শ্বচর বাঙ্গালী আসামে আগমন করিয়াছেন, আর তাঁহাদিগের দ্বারাই প্রধানতঃ অসমীয়া বন্ধুগণের শিক্ষা-দীক্ষা সংসাধিত হইয়াছে। বাঙ্গালী শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করেন নাই, বাল্যে বাঙ্গালাই মাতৃভাষার ন্যায় বিদ্যালয়ে পাঠ করেন নাই, বাঙ্গালার কাব্যোপন্যাস তাঁহার রচনা-প্রণালী সংগঠনে সহায়তা করে নাই,—নব্য অসমীয়া লেখকগণের মধ্যে এরূপ কথা কয়জন সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারেন? জনকয়েক বাঙ্গালী কুলাঙ্গারের অবৈধ ব্যবহার অসমীয়া বন্ধুগণের বিসদৃশ বোধ হইলেও, শিক্ষিত অসমীয়ামাত্রের বসন-ভূষণে, চাল-চলনে, সাহিত্য-গঠনে, সমাজ-সংস্থাপনে যে বাঙ্গালা ভাব ওতঃ-প্রোতঃ ভাবে সংজড়িত, ইহা নিঃশঙ্কচিত্তে ঘোষণা করা যাইতে পারে। কৃতবিদ্য অসমীয়া বন্ধুগণও একবাক্যে বাঙ্গালীর নিকট তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কৃপণতা করেন না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে বাঙ্গালীর সহিত অটুট সংশ্রব এবং অসমীয়ার পরিবর্ত্তে বঙ্গভাষা শিক্ষা অসমীয়া বন্ধুগণের স্বকীয় ভাষার সমৃদ্ধি বর্দ্ধনে কি পরিমাণে কার্য্যকরী, তাহাও সহৃদয় পাঠকবর্গের বিবেচ্য।

এখন এই অসমীয়া বাঙ্গালার সংশ্রব-ঘটিত অবান্তর দুই-এক কথার আলোচনা পূর্ব্বক প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক। শ্রুতি ও স্মৃতির কাল অতীত হওয়ার পর, ভাষা

সৃষ্টির সঙ্গে অক্ষরোৎপাদনের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী বোধ হয়। অসমীয়া গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য কোন্ সময়ে অক্ষর সৃষ্টি হইয়াছিল, আলোচ্য প্রবন্ধে তাহার বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় অসমীয়া ভাষায় বঙ্গাক্ষরই অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়,—এক রকার ও অন্তঃস্থ বকার ব্যতীত কোন বৈলক্ষণ্যই বোধ হয় না; এ দুই অক্ষরও প্রাচীন বঙ্গাক্ষরের অনুরূপ। এই দুই অক্ষর সম্বন্ধে পণ্ডিতবর রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় যে তথ্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা এইস্থানে উদ্ধৃত করা গেল—

"এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়দিগের গৃহে ৩।৪ শত বৎসরের হস্তলিখিত যে সকল সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অক্ষর সকল এক্ষণকার অক্ষর অপেক্ষা অনেকাংশে বিভিন্ন। সচরাচর ঐ সকল অক্ষরকে 'তিরুটে' (ত্রিহুতী) অক্ষর বলে। ঐ অক্ষরে দেবনাগরের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। দেবনাগরে অন্তঃস্থ ব ও বর্গীয় ব বিভিন্ন প্রকার; ঐ তিরুটে অক্ষরেও দুই বকারের বিভিন্নতা দেখা যায়—যথা অন্তঃস্থ বকার (র) এইরূপ, বর্গীয় বকার (ব) এইরূপ এবং রকার (ৰ) এইরূপ। এক্ষণকার বাঙ্গালা বর্ণমালায় বকারদ্বয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই এবং রকার পূর্ব্বকালীন অন্তঃস্থ বকারের পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন রকার যে অধিক দিন ভিন্নবেশ হইয়াছে, তাহা নহে। অদ্যাপি পল্লীগ্রামের সাবেক গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় 'কর-পারা ব পেটকাটা' বলিয়া রকার লেখান হইয়া থাকে।" *

আসামে ঠিক প্রাচীন রকার ও অন্তঃস্থ বকার আজি পর্য্যন্ত চলিতেছে; অন্তঃস্থ বকারের তলদেশে বিন্দুর পরিবর্ত্তে

---

* বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—৪-৫ পৃষ্ঠা।

হসন্ত চিহ্ন ব্যবহৃত হয় বটে, কিন্তু ঐ হসন্ত চিহ্ন বিন্দুরই রূপান্তর মাত্র, আর, আমাদিগের স্মরণ হয়, ত্রিহুত-প্রবাস-কালে মৈথিল পণ্ডিতগণের লেখাতেও আসামের ন্যায় অন্তঃস্থ বকারের তলে বিন্দুর পরিবর্ত্তে হসন্ত চিহ্ন ব্যবহৃত হইতেই দেখিয়াছি। ফলতঃ, ত্রিহুতী, অসমীয়া ও বাঙ্গালা—এই ত্রিবিধ অক্ষর যে এক, এ পক্ষে কোন মতভেদের আশঙ্কা দেখা যায় না। ৺শঙ্করদেবের সময়ে বঙ্গ ও মিথিলায় একই অক্ষর চলিত। তিনিও বঙ্গদেশে ঐ অক্ষর শিখিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সেই অক্ষরেই আপন গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও অসমীয়া ভাষার অবিচ্ছিন্ন ভাবের ইহাও অন্যতম প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

আলোচ্য প্রবন্ধের মুখবন্ধে যে কয়েকটী কথা লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই দেখা যাউক, বর্ত্তমান অসমীয়া ও বাঙ্গালা ভাষার কতদূর প্রকৃতি ও রচনাগত পার্থক্য। লেখক লিখিয়াছেন—

"আলোচনা আরু আন্দোলনেই সকলো বিধ উন্নতিব মূল। আজি কালি অনেকে অসমীয়া ভাষাব বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ধৰিছে, আরু কোনো কোনোৱে আন্দোলন কৰিবলৈকো আগ বাঢ়িছে; এই বিলাক দেখি শুনি, আমার মনত অসমীয়া ভাষাব উন্নতিব আশাই বব দকৈ শিপাইছে। জগদীশ্বরব ওচৰত একান্ত মনে প্রার্থনা কৰোঁ। যেন, আমাব এই আশাব পুলিটি দুপতীয়াতে জঁয় ন পৰে। বব বেজাবব কথা আজিলৈকে, বিদেশীব কথাকে নকওঁ, অনেক অসমীয়া মানুহব মনতো অসমীয়া ভাষাব বিষয়ে বহুত খুঁছুৰি আছে—কোনোৱে কয়, অসমীয়া ভাষা এটা বেলেগ সাহিত্য

থকা স্বতন্ত্ৰীয়া ভাষা ন হয়, ইহা বঙ্গালী ভাষাৰ চহা অৱস্থা মাথোন; কোনোৱে ইয়াক এটা বেলেগ ভাষা বুলি স্বীকাৰ কৰিও ইয়াৰ আৱশ্যকত্ব স্বীকাৰ ন কৰে; কোনো কোনৱে আকৌ ইয়াক এটা বেলেগ ভাষা বুলিও গম্ভি কৰে, আৰু ই যে অসমীয়া মানুহৰ পক্ষে নিতান্ত লাগতীয়াল তাকো মানে, কিন্তু তাৰ উন্নতি কথা পক্কত তেনেই উদাস; তেঁওবিলাকৰ মতে বঙ্গালী আৰু অসমীয়া দুইটা সংস্কৃত মূলক ভাষা, সেই গুণে অসমীয়াৰ ভাষাৰ উন্নতি কৰিবলৈ গলে সি ভাষাৰ কালনৈ চাল লব আৰু শেহত বঙ্গালী ভাষাৰে সৈতে এটা ভাগা হৈ পৰিব।"

উল্লিখিত অংশের রচনা-প্রণালী (style) এবং বাক্য-যোজনা (diction) যে আধুনিক বঙ্গভাষার অনুরূপ, বঙ্গ-ভাষাভিজ্ঞ মাত্রেই ইহা সহজে অনুভব করিতে পারেন,—ফলতঃ, বাঙ্গালা ভাব ও বাঙ্গালা ভাষার সহিত দুই চারিটী অসমীয়া গ্রাম্য শব্দের সংমিশ্রণে উহা গঠিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। 'আৰু', 'আন্দোলনেই', 'সকলো', প্রভৃতি কয়েকটী কথায় উকার, একার এবং ওকার সংযোজিত করিয়া বাঙ্গালার সহিত পার্থক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা হইয়াছে; পরন্ত, 'ধরিছে', 'বাঢ়িছে', 'দেখি শুনি', 'গলে', 'পরিব' প্রভৃতি বাক্যে 'য়া', 'তে' ও 'এ'কার' লুপ্ত করিয়া স্বাতন্ত্র্যের চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছে—এই সকলের লোপ, গদ্যে না হইলেও, বাঙ্গালা পদ্যে এখন পর্য্যন্ত সাধিত হইয়া থাকে। 'করিবলৈ' 'কোনোৱে', 'আজিলৈকে', 'ৰি' প্রভৃতি কথা 'করিবার জন্ত', 'কোন', 'আজি পর্য্যন্ত',

'সে' প্রভৃতি বাঙ্গালা কথার রূপান্তর মাত্র। কলিকাতা অঞ্চলের শৌণ্ডিক, সুবর্ণ বণিক প্রভৃতি কয়েক জাতি এবং কৃষ্ণনগর, বীরভূম, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের অনেক লোক 'ড়' উচ্চারণ করিতে পারেন না—'র' বলিয়া থাকেন; অসমীয়া 'বর', 'পরিব' প্রভৃতি কথায় সেই কারণেই 'ড়' স্থানে 'র' ব্যবহৃত হইয়াছে—প্রভেদের মধ্যে 'ড়'-উচ্চারণে অসমর্থ বাঙ্গালী লিখিবার সময় 'ড়'ই লিখিয়া থাকেন, আর তদ্রূপ অক্ষম অসমীয়া উচ্চারণমত অক্ষরই ব্যবহার করেন। 'মানুহর' এবং 'শেহত' এই দুই বাক্যে অসমীয়া কোন্ ব্যাকরণ মতে 'ষ'র পরিবর্ত্তে 'হ' ব্যবহৃত হইয়াছে,—আমরা বলিতে অক্ষম; আমরা যতদূর অবগত আছি, তাহাতে লিখিবার সময় 'ষ' ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য, কেবল ঐ বর্ণ উচ্চারণে অসামর্থ্য প্রযুক্ত তাহা 'হ' বলিয়া উচ্চারিত হয় মাত্র। * এই 'ষ' স্থানে 'হ'র উচ্চারণ শ্রীহট্টাঞ্চলেও কিয়ৎ পরিমাণে শুনা যায়, কিন্তু তজ্জন্য লিখিত ভাষায় 'হ'র ব্যবহার চলে না, উহা একটা ভাষা বিভিন্নতার লক্ষণ বলিয়াও গণ্য হয় না। 'আগ বাঢ়িছে', 'পুলিটি' (নব তৃণাঙ্কুর; বাঙ্গালায়

---

* There is a further difference in pronunciation, which more than anything else tends to make interchange of ideas difficult between a speaker of Bengali and of Assamese, *viz.*, the change of the letters *sh* and *s* to *h* and of *chh* and *ch* to *s*.—Report on the Census of Assam, 1891 Part II, Chap. VIII, para. 160.

ক্ষুদ্রার্থে—যথা, ছেলে-পুলে), 'বেজারর', 'খুঁকুরি' (সন্দেহ), 'গস্তি', 'লাগতীয়াল' (বাঙ্গালায় 'লাগমত'), 'ঢাল', প্রভৃতি বাঙ্গালার দেশজ শব্দ মাত্র (only a corrupt and vulgar dialect of Bengali)† ; অসমীয়ার স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন চেষ্টায় বিশুদ্ধ লিখিত ভাষায় এরূপ অপভাষার অবাধ ব্যবহার সদ্বিবেচনার কার্য্য বোধ হয় না। 'মনত', 'ওচরত', 'পক্ষত' প্রভৃতি সপ্তম্যন্ত পদে 'ত'এর ব্যবহার বাঙ্গালার 'তে'র অনুরূপ ; মনেতে, গোচরেতে, পক্ষতে প্রভৃতির 'তে'র কার্য্য আজি কালি বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় মাত্র একার দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, অসমীয়াতে এখনও পূর্ব্ব রীতি বিদ্যমান। 'জগদীশ্বরর', 'বেজারর', 'মানুহর' প্রভৃতি পদস্থিত সম্বন্ধ-সূচক র-এর পূর্ব্ববর্ত্তী বর্ণগত একার বিলোপ দ্বারা বাঙ্গালার পদ্ধতি হইতে পার্থক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে; উড়িয়া ভাষাতেও অবিকল ঐ ভাবে র ব্যবহৃত হইয়া থাকে—ইহাতেও আমাদিগের পূর্ব্বকথিত মিথিলা, উড়িষ্যা ও আসাম সীমা পর্য্যন্ত বঙ্গভাষার বিস্তৃতিরই পরিচয় বুঝা যায়। 'দৃঢ়কৈ শিপাইছে' = বদ্ধমূল হইয়াছে, 'বেলেগ' = পৃথক্, 'মাথোন' = মাত্র, 'বিলাক' = সমূহ, 'ফাললৈ' = দিকেই, প্রভৃতি কয়েকটী কথা বাঙ্গালা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ প্রতীয়মান হয় বটে ; নচেৎ 'ওচরত' = গোচরে, 'দুপতিয়াতে' = দুই পাতায়, 'অঁর' =

† ৫৩ পৃষ্ঠায় তলে টিপ্পনী দেখুন।

যায়, 'স্বতন্তরীয়া' = স্বতন্ত্র, 'ইয়ার' = ইহার, প্রভৃতি কথায় বাঙ্গালার প্রকৃতি ও পরিচ্ছদ সম্যক্ পরিদৃশ্যমান। "অসমীয়া ভাষা"র প্রবন্ধ-লেখক গোস্বামী মহাশয় নিজ প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ব্রাউন সাহেবের মতে, অসমীয়া ভাষার মধ্যে শতকরা ৭ টী অকা, ৫ টী মগ, ১ টী খাম্‌টী, ১ টি আবর, ২৩ টী মিশমি এবং ৬৩ টী সংস্কৃত মূলক শব্দ; উপরি উদ্ধৃত অংশে, এবং অসমীয়া ভাষার সর্ব্বত্রই দেখা যায়— সংস্কৃত মূলক শব্দ মাত্রেরই আকার ও পরিচ্ছদ বাঙ্গালার স্থায়; কেবল অনার্য্য অকা, মগ, খাম্‌টী, আবর প্রভৃতি জাতির ভাষা উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে পৃথক্ ভাষা-রূপে পরিণত করিয়াছে এবং লিঙ্গ, বচন, কারক, ক্রিয়া-দিতেও, বাঙ্গালার তুলনায়, কিঞ্চিৎ রূপান্তর ঘটাইয়াছে। এরূপ অবস্থায়, যে সমস্ত অসমীয়া ভদ্রলোকের মতে "বাঙ্গালা এবং অসমীয়া দুইটাই সংস্কৃত মূলক ভাষা, তজ্জন্য অসমীয়া ভাষার উন্নতি করিতে গেলে বাঙ্গালা ভাষার দিকেই পরিণতি দাঁড়াইবে এবং শেষে উভয় ভাষা একীকৃত হইবে", * তাঁহা-দিগেরই পরিণামদর্শিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় এবং প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের স্থায় দুঃখ করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। শব্দ-শক্তির অনির্ব্বচনীয় প্রভাব; ভিন্ন ভিন্ন রাজার শাসন কালে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার বিস্তর কথা আমাদিগের

* উপরি উদ্ধৃত অংশের শেষাংশ দেখুন।

ভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছে—বাঙ্গালার গ্রাম্য ভাষায় এজন্য অনেক আরব্য, পারস্য প্রভৃতি যাবনিক কথা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, অধুনা চলিত ভাষায় অনেক ইংরাজি কথাও অলক্ষ্যে প্রবেশলাভ করিতেছে। লিখিত ভাষায় ঐ সমস্ত গ্রাম্য ও দেশজ কথা পরিহার এবং ভাষার তেজ ও বিশুদ্ধতা বর্দ্ধন করিতে গেলেই আমাদিগকে সংস্কৃতের আশ্রয় লইতে হয়; স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক ইংরাজি কথার প্রতিশব্দ সংস্কৃত-মূলক করিয়া বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন, এখনও অনেক কৃতবিদ্য বঙ্গীয় লেখক তাঁহার প্রবর্ত্তিত পথ অনুসরণ করিতেছেন। অসমীয়া ভাষার প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে গেলেও উহা হইতে ঐরূপ অনার্য্যজাতির কথা সমস্ত দূর করিয়া, তাহার স্থানে সংস্কৃত মূলক বিশুদ্ধ বাক্য সন্নিবিষ্ট করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, আর তাহা হইলেই বাঙ্গালা ও অসমীয়ার অভেদ অবস্থা দাঁড়াইবার সম্ভাবনা।

ইংরাজি ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত আসামের আদালত ও বিদ্যালয় সমূহে বঙ্গভাষাই প্রচলিত ছিল। তখন পর্য্যন্ত বঙ্গ ও অসমীয়া ভাষা বিভিন্ন বলিয়া কোন অসমীয়ারই বোধ ছিল না,—অসমীয়া মাত্রেই মাতৃভাষা নির্ব্বিশেষে বঙ্গভাষায় পরিচর্য্যা করিতেন। পরে, নব্য অসমীয়া বন্ধুগণের মতে, আসামের সাহিত্য-আকাশে সৌভাগ্য-সূর্য্য উদিত হইল,—বিখ্যাত Baptist Mission Society নামক খ্রীষ্টশিষ্যগণ

আসামের সাহিত্য-গঠনে তৎপর হইলেন,—শিবসাগরে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক অসমীয়া ভাষায় খ্রীষ্টধর্ম্মের গ্রন্থাবলী প্রণয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়ও এ পক্ষে সামান্য সহায়তা করেন নাই, তাঁহাদিগের যত্নেই নবগঠিত অসমীয়া ভাষায় 'বাইবেল' অনুবাদিত হইল; মাননীয় Robinson এবং Brown সাহেব কর্ত্তৃক অসমীয়া ভাষার ব্যাকরণ বিরচিত হইল; পাদরিপুঙ্গবদিগের দ্বারা 'অরুণোদয়' নামক অসমীয়া ভাষায় প্রথম মাসিক সমালোচনা-পত্র প্রকাশিত হইল; এবং ক্রমশঃ Branson নামক জনৈক সাহেব কর্ত্তৃক অসমীয়া ভাষার অভিধানও আবিষ্কৃত হইল। এ ঘটনা অসমীয়া বন্ধুগণের বিবেচনায় সৌভাগ্যের বিষয় হইতে পারে এবং তাঁহারা তদ্দারা জাতীয় গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা ইহাতে দুই বিন্দু অশ্রুবর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারি না। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের নবজীবন সঞ্চারের নিমিত্ত স্বর্গীয় মহানুভব শঙ্করদেব কর্ত্তৃক যে ভাষা গঠিত হইয়াছিল, আজ খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য ইংরাজ হস্তে সেই ভাষার নূতন পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইল। বাটীর পার্শ্বের বাঙ্গালী বিদেশী হইল, আর সাগর-পার হইতে সাহেব আসিয়া স্বদেশী হইলেন! মাতৃভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ ম্লেচ্ছ মিশনারী আসিয়া প্রণয়ন করিলেন! পতিত ভারতের পক্ষে ইহাপেক্ষা সৌভাগ্যের পরিচয় আর কি হইতে পারে? মিশনারী সাহেবগণ কর্ত্তৃক যেরূপ

পরিমার্জ্জিত ভাষা সৃষ্ট হইয়া থাকে, "মথি লিখিত সুসমাচার"-পরিজ্ঞাত পাঠককে তাহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না; আর উল্লিখিত অভিধান সম্বন্ধে উত্তর-পূর্ব্ব বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক পোর্টর সাহেব ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের স্বীয় বিজ্ঞাপনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে,—

"আসামীদিগের জন্য আসাম মিশনারীদের কীর্ত্তি স্থানে কিত্তি, অকীর্ত্তন—অকিত্তন, অকৃতজ্ঞ—অক্রিতজ্ঞ, অক্ষয়—অখাই, অশ্রদ্ধা—অচধ্যা, অচিহ্ন—অচিন, যবক্ষার—জখার, ইত্যাদি সন্নিবেশ করিয়া স্বতন্ত্র অভিধান লিখিবার কিছুই আবশ্যকতা ছিল না। ইহাতে কেবল বিশুদ্ধ বাঙ্গালাকে নাশ করা হয় মাত্র।" *

অসমীয়া ও বাঙ্গালার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস, বুদ্ধিমান পাঠক ইহা হইতেই বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আমাদিগের আলোচ্য বিষয় এত গুরুতর যে, সামান্য প্রবন্ধে তাহার সম্যক্ বিচার সম্ভবে না, আর, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। 'জোনাকী'র প্রবন্ধাতীত ইতিহাসও আমরা কিছুমাত্র অবগত নহি। ঐ প্রবন্ধ হইতেই আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখা যায়, হিন্দুরাজত্ব কালে আসাম প্রদেশে সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল; মধ্যে অনার্য্য জাতির অভ্যুদয়ে আসামের স্বাধীনতার সহিত ভাষাও বিলুপ্ত হইয়াছিল; পরে

* "উড়িয়া স্বতন্ত্র ভাষা নহে" নামক গ্রন্থের ৬৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

আহম-প্রাধান্য যুগে ৺শঙ্করদেব কর্তৃক বঙ্গভাষার অনুরূপ ভাষা এদেশে প্রবর্ত্তিত হয় এবং ইংরাজ-রাজত্বের সূত্রপাত হইতে বঙ্গদেশীয় শিক্ষকগণের শিক্ষায় ১৮৭১ অব্দ পর্য্যন্ত লিখিত ভাষায় বাঙ্গালাই অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ইত্যবসরে মিশনারী সাহেবগণের চেষ্টায় বাঙ্গালাকে বিকৃত করিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিগত কতকগুলি শব্দ মিশ্রিত করিয়া অসমীয়া ভাষার নব কলেবর গঠিত হইয়াছে, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া অসমীয়া নব্য কৃতবিদ্য বন্ধুগণ অসমীয়া ভাষার স্বাতন্ত্র্য নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং সরকার বাহাদুরও তাহাতে পোষকতা করিতেছেন। ভাষাভেদ যে ভারতের অধঃপতনের অন্যতম হেতু, ইহা সকলেই আজ-কাল অনুভব করিতে পারেন; ঐক্য-বল-সংস্থাপনের চেষ্টায়, সে জন্য, আজ-কাল জাতীয় মহাসমিতিতে পরস্পর চিত্ত-বিনিময়ের উৎকৃষ্ট উপায় একভাষা প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে এবং, ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্য উপায় না থাকায়, ইংরাজির দ্বারা সে প্রয়োজন সাধিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায়, কৃত্রিম উপায়ে এক ভাষার মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ সাধন করিয়া, অসমীয়া বন্ধুগণ কিরূপ সদ্বিবেচনার কার্য্য করিতেছেন—ইহা স্থির চিত্তে চিন্তা করিতে অনুরোধ করাই আমাদিগের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

• [এই প্রবন্ধ সূত্রে অসমীয়া বন্ধুগণ আমাদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াছেন, বোধ হয়; অন্ততঃ কামরূপের নব প্রতিষ্ঠিত 'আসাম' নামক

সম্বাদপত্রে এইরূপ আভাস পাওয়া যায়,—শীঘ্রই এ প্রবন্ধের প্রতিবাদ হইবে বলিয়াও উক্ত পত্রে প্রকাশ আছে। বাদ-প্রতিবাদ আমাদিগের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে—উদ্দেশ্য প্রবন্ধের উপসংহারে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করিয়াছি; সৌভাগ্যের বিষয়, বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ 'সাহিত্য'-সম্পাদক মহাশয় আমাদিগের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়াছেন এবং বঙ্গীয় 'সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা'র সুযোগ্য সম্পাদক স্বনামখ্যাত পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—"আমরাও সর্ব্বান্তঃকরণে প্রবন্ধ-লেখকের মতের অনুমোদন করি। ভাষাভেদে জাতীয় একতার হানি হয়। জাতীয় বলবৃদ্ধির জন্য ভাষার অভিন্নতা বাঞ্ছনীয়। এখন এই অভিন্নতা রক্ষার চেষ্টা করাই সঙ্গত। ভেদসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সুবুদ্ধির লক্ষণ নহে। বাঙ্গালা, আসাম ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের ভাষার মূল এক। সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে দেখা যায় যে, এক বাঙ্গালাই রূপান্তরিত হইয়া আসামে ও উড়িষ্যায় ভিন্ন ভাষারূপে পরিগৃহীত হইতেছে। ভাষার এইরূপ বিভিন্নতায় জাতিগত পার্থক্য ঘটিয়াছে। এই পার্থক্য দূর হয়, এক-বিধ ভাষার শক্তিতে বাঙ্গালী, আসামী, উড়িয়া এক মহাজাতি হইয়া উঠে, ইহাই প্রার্থনীয়।"—এই প্রার্থনা অসমীয়া বন্ধুগণের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইবার নিমিত্ত, প্রতিবাদের অপেক্ষা না করিয়া, প্রবন্ধটি আমাদিগের আসাম-প্রবাসের এই অস্ফুট স্মৃতির সহিত অটুট বন্ধনে বন্ধ করিয়া রাখিলাম; ভরসা করি, সহৃদয় বন্ধুগণ আমাদিগের এই ধৃষ্টতা উপেক্ষা করিবেন।]

খাসিয়া-পাহাড় ও খাসিয়া-জাতি।

সূচনা।—১২৯৪ বঙ্গাব্দের চৈত্র-মাস—সে বহুদিনের কথা—যখন আসাম-সীমায় প্রথম পদার্পণ করি, যখন প্রবাস হইতে হইতে প্রবাসান্তরের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়ি,—যখন পুরাতন ছাড়িয়া নূতনের নবীনত্বে 'দিশেহারা' হই,—সেই একদিন, আর এই একদিন! এখন আর সে ভাব নাই, এখন নূতন আবার পুরাতন হইয়াছে—নব-সংসর্গে অতীতের পূর্ব্বস্মৃতি ক্রমে ক্রমে ভুলিতে শিখিয়াছি,—এখন নবীনের নূতনত্বে গা' ঢালিয়া আবার 'মাথামাথি', করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। ভবিষ্যতের দৃশ্য এতই ভয়াবহ,—জীবনের ভবিষ্যৎ অধ্যায় আসামের সংসর্গে কিরূপ ঘটনা ঘটাইবে, ভাবিয়া অস্থির হইয়াছিলাম; বর্ত্তমানের মোহে পড়িয়া, আপাত-মনোরম স্বচ্ছন্দতায় স্নিগ্ধ হইয়া, সে অস্থিরতা এখন তিরোহিত হইয়াছে,—এখন আবার এ অধ্যায়ের অন্তরালে কিরূপ পরিণাম প্রচ্ছন্ন আছে, এই চিন্তাই মধ্যে মধ্যে অন্তরাকাশে অমান্ধকার ঢালিয়া দেয়—উদাস প্রাণে ক্ষণিক মর্ম্মভেদী ভীতি সঞ্চার করে।

মানুষ ভ্রান্ত,—বর্ত্তমানের কুহকে পড়িয়া ভবিষ্যতের ভাবনা বড় ভাবিতে পারে না ; ভাবিলেও,বোধ করি, সংসার চলে না। বরং উপস্থিত অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া সংসারে চলিতে পারিলেই এই পাপ-তাপময় কঠোর হৃদয়েও কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করা যায়। ভবিষ্যতের গর্ভে ভাগ্যে যাহাই থাকুক, আমরা এখন বর্ত্তমান লইয়াই ব্যতিব্যস্ত—বর্ত্তমান বিষয়ের আলোচনাতেই তাই উপস্থিত বদ্ধপরিকর। প্রবাসের প্রথম পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম,—"খাসিয়া শৈলের এবং আসামের অন্যান্য স্থানের বৃত্তান্ত সাধ্যমত বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল" ; তার পর "দুই চারিটী কথা" না বলিয়াছি এমন নহে ; আসামের সামাজিক আনন্দোৎসব "বিহু"র চিত্রও বঙ্গীয় পাঠকের সমক্ষে ধরিয়াছি এবং বঙ্গ-সুন্দরীগণের মনোরঞ্জনার্থ তাঁহাদিগের অপরিচিতা ভগিনী "অসমা-সুন্দরী"গণের পরিচয় দিতেও সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি ; অধিকন্তু, অসমীয়া বন্ধুগণের সহিত একপ্রাণতা স্থাপনোদ্দেশে তাঁহাদিগের ভাষার স্বাতন্ত্র্য অপনোদনেরও অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছি। কিন্তু এ সকলই শুনা কথার উপর নির্ভর করিয়া, —আসামের সকল দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ বড় কখন ঘটে নাই। এবার একটু চাক্ষুষ বৃত্তান্ত বলিব।

বিধাতার বিচিত্র লীলা—অনন্ত পুরুষের অপার করুণা! দারুণ দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেও সুখশান্তির অস্ফুট ছায়া প্রচ্ছন্ন থাকে, ভ্রান্ত জীব মনুষ্য তাহারই আশ্রয়ে জীবন ধারণ

করে। বহুকাল একস্থানে অবস্থিতি করার পর আসামপ্রবাসের অজানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ের চিন্তা মনকে প্রথমতঃ বড়ই আন্দোলিত করিয়াছিল; পরন্তু "কালাজ্বরে"র প্রবল প্রকোপে আসামের অধিকাংশ স্থল শ্মশানে পরিণত,—সেই শ্মশানের ভীষণ ভাব অন্তরে সহজেই ভীতিসঞ্চার করে। কিন্তু, সৌভাগ্য-ক্রমে, দুর্গতিহারিণী দয়াময়ীর অপার দয়াগুণে সে শ্মশানের দৃশ্য আমাকে দেখিতে হয় নাই। প্রথমাবধিই আসামের মনোজ্ঞ ভূমি, প্রীতিশান্তির বিনোদ ক্ষেত্র, খাসিয়া-শৈলের শিখরদেশে স্থান পাইয়াছি, সেই সুখে অন্যবিধ দুশ্চিন্তা ভুলিতে পারিয়াছি, আজি সেই সুখের আবেগেই শান্তি-ক্ষেত্র খাসিয়া-শৈল সম্বন্ধে দুই চারি কথা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ভৌগোলিক।—খাসিয়া শৈলের কথা বলিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তী পর্ব্বতের কথা বলিতে হয়। বস্তুতঃ এই দুইটী পর্ব্বত যেন যমজ সহোদরের ন্যায় পরস্পর স্নেহা-লিঙ্গনে মিশামিশি করিয়া রহিয়াছে; ইংরাজের রাজনৈতিক কার্য্য-বিভাগেও এ দুইটী সমসূত্রে জড়িত—একই জেলা বলিয়া পরিগণিত। এই সম্মিলিত শৈলযুগলের উত্তরে কাম-রূপ ও নবগ্রাম (Nowgong) জেলা। কলিকাতা হইতে আগমন কালে এই কামরূপ অতিক্রম করিয়া খাসিয়া-পর্ব্বতে অধিরোহণ করিতে হয়। বঙ্গপুর-মহিলা-মহলে, অধিক কি—ভৌগোলিক তত্ত্বানভিজ্ঞ পুরুষের দলেও, কামরূপের পর আর

দেশ আছে বলিয়া ধারণাই নাই। এখন পর্য্যন্ত স্বদেশে বন্ধুর পার্শ্বে খাসিয়া-শৈলে প্রবাসের কথা উত্থাপন করিলে, উহার ভৌগোলিক অবস্থা ভাল করিয়া বুঝাইতেই মস্তক ঘুরিয়া যায়,—"আসাম-গোয়ালপাড়া কামরূপ-কামাখ্যা" অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, ভেড়া না বনিয়া মনুষ্য-দেহেই দেশে ফিরিতে পারিয়াছি, একথা সহজে কেহ বিশ্বাস করিতেই চাহেন না। ইংরাজের অনুকম্পায় কিন্তু আজ-কাল কোন স্থানে যাইতেই কষ্ট নাই, আর বাঙ্গালীর ন্যায় অন্নসংস্থান-বিহীন জাতিও ভারতে দ্বিতীয় নাই, তাই এই প্রাচ্য সীমান্তপ্রদেশও অধুনা বাঙ্গালীর "ভাত-ঘর" হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—এই পর্ব্বতদ্বয়ের পূর্ব্বে উত্তর-কাছাড় ও নাগ-পর্ব্বত এবং কপিলী নদী; দক্ষিণে শ্রীহট্ট; এবং পশ্চিমে গারো-পাহাড়। খাসিয়া-পাহাড়ের প্রাকৃতিক শোভা এই সীমান্তব্যবচ্ছেদেই সুন্দরভাবে প্রতীয়মান;—উত্তরে-দক্ষিণে সমতল প্রদেশ, আর সেই প্রদেশের বক্ষঃ ভেদ করিয়া একদিকে বিশাল নদ ব্রহ্মপুত্র বীরদর্পে বহিয়া যাইতেছে, অপরদিকে সুশীলা 'সুরমা' নদী সরম-সোহাগে যেন গড়াইয়া পড়িতেছে; পূর্ব্বে-পশ্চিমে অগণ্য পর্ব্বতশ্রেণী অনন্তের পথে অগ্রসর হইতেছে।

প্রাকৃতিক।—পাহাড়ে দেশ অগণ্য পাহাড়ে পরিপূর্ণ;—"যেদিকে ফিরাই আঁখি, কেবল পাহাড় দেখি"—পাহাড় ভিন্ন আর পদার্থ নাই। এ, ভূগোলের সূত্রগত বা মানচিত্রে শ্বেত-কৃষ্ণে জড়িত পাহাড় নহে,—নগ্ন চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত শুভ্র

শত পর্ব্বত প্রকৃতির শোভা বিস্তার করিতেছে, উচ্চে—অতি উচ্চে—মস্তক উত্তোলন করিয়া সর্ব্বোচ্চ বিশ্বপতির বিশ্বরাজ্যের উচ্চতার পরিচয় দিতেছে, আর দলে দলে মিলিত হইয়া ঐক্য-বলের দর্প ঘোষণা করিতেছে। পর্ব্বত-দুহিতা নদীও অগণ্য; গঙ্গা-যমুনা, গোদাবরী-সরস্বতীর ন্যায় দিগন্ত-প্রসারিণী কল-নাদিনী নদী নহে,—পর্ব্বত-নিঃসৃত জলপ্রবাহে সম্মিলিতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী রজতসূত্রের ন্যায় ক্ষীণদেহে পর্ব্বতের বক্ষঃ ভেদ করিয়া নিম্নপথে ঝুর-ঝুর রবে বহিয়া যাইতেছে, কেহ বা যৌবন-জোয়ারের জোরপ্রবাহে বহিয়া গিয়া অদূরে চিরযৌবন ব্রহ্মপুত্রের প্রশান্ত প্রেম-প্রবাহে আত্মোৎসর্গ করিতেছে। পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে ২০।২২টী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য; ইহাদিগের উচ্চতা ৪০০০ হইতে ৬৫০০ ফীটের মধ্যে। খাসিয়া-শৈলের রাজধানী শিলঙ্ সহরের সন্নিকটস্থ পর্ব্বতশৃঙ্গই সর্ব্বোচ্চ—ইংরাজের হিসাবে উহা সমুদ্রতলের ৬৪৪৯ * ফীট ঊর্দ্ধে অবস্থিত।

প্রবাদ শুনিয়াছিলাম, এই সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গে অধিরোহণ করিয়া সুদূর ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন-লালসায় বহু প্রয়াসে আমরা এক দিবস ঐ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলাম; দুর্ভাগ্যক্রমে, ব্রহ্মপুত্র

---

* ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডাক্তার ওল্ডহাম সাহেবের মতে ইহার উচ্চতা ৬১২৪ ফীট।

আমাদিগের নয়নগোচর হইল না, অদূরে শিলঙ্ সহর এবং শ্বেতবটিকাবৎ তন্মধ্যস্থ গৃহাবলী ও পিপীলিকাপুঞ্জ সদৃশ মনুষ্যের গমনাগমন দেখিয়াই পথ-পর্য্যটন-ক্লেশ পরিশোধ করিয়া আসিলাম। অত্রত্য অধিবাসী খাসিয়ারা কিন্তু "সহ-পেট-বাইনেঙ্" নামক পর্ব্বতকে সর্ব্বোচ্চ বলিয়া জানে; ঐ সুদীর্ঘ খাসিয়া-শব্দের অর্থ—আকাশের নাভিদেশ,আর 'কূপ-মণ্ডূক' খাসিয়ার ধারণা—উহাই সসাগরা পৃথ্বীর কেন্দ্রস্থল। প্রত্যুত, উহা উল্লেখযোগ্য পর্ব্বতগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন—উহার উচ্চতা ৪০০০ ফীট্ মাত্র। নদীগুলির মধ্যে কপিলী ও বড়পাণিই প্রসিদ্ধ; ইহারা উভয়েই ব্রহ্মপুত্রের সহিত সম্মিলিতা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, কপিলী,বড়পাণি, প্রভৃতি নাম বাঙ্গালী বা অপর বিদেশী কর্তৃক প্রদত্ত; খাসিয়ার অভিধানে উহার অন্য নাম আছে। খাসিয়ার "উম্" শব্দ, সাধারণতঃ, সলিলার্থে ব্যবহৃত হয়; নদী, তড়াগ বা অন্য জলাশয় মাত্রই খাসিয়ার নিকট "উম্"-পদবাচ্য। "বড়পাণি"র খাসিয়া নাম—উম্ইয়াম্; এইরূপ উম্-ক্রু, উম্সাও, উম্-থেন প্রভৃতি কত উমই আছে,সে সমস্তের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পর্ব্বতশৃঙ্গের অধিকাংশই শুণ্ডাকৃতি এবং সুন্দর লতাবিতানে সমাচ্ছাদিত। শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ মস্তকোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে সমতল উচ্চভূমি শৃঙ্গগুলির পরস্পর উচ্চনীচত্বের বৈলক্ষণ্য বিকাশ করিতেছে। এই সকল উচ্চভূমির অনেক-স্থল বালুকাময় এবং তাহারই গাত্র বিধৌত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

সরিন্মালা প্রবাহিতা। অন্যান্য প্রদেশের পর্ব্বত মালার ন্যায় এখানকার পাহাড়ের উপরিভাগ প্রস্তরময় নহে; নবীন নধর কিশলয়ে সদাই অতি সুশোভিত,—যেন সুবিশাল করি-পৃষ্ঠ তৃণাস্তরণে আচ্ছাদিত; আর মধ্যে মধ্যে সুললিত লতাকুঞ্জে মনোজ্ঞ ভাব সঞ্চারিত। এই সকল লতাকুঞ্জ সুরভি বনজ কুসুমে, সুখকর দারুচিনি বৃক্ষে, এবং বিকচ বনবল্লরীতে পরিপূর্ণ; দেখিলে, বাস্তবিক, শান্তিরসাস্পদ তাপসাশ্রম বলিয়া বোধ হয় এবং কি এক অব্যক্ত দেবভাবে মনঃপ্রাণ মাতুয়ারা হইয়া উঠে। এই চিরন্তন দেবভাবে ইহারা পূর্ব্বাপর কাঠুরিয়ার কঠিন কুঠার হইতে আত্ম-সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু অধুনা কারুকর্ম্মা ইংরাজের সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা হইতে নিস্তার পায় নাই। বনের কুসুম এতকাল বনেই বিলীন হইয়া সহৃদয় সুকবির—

"Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness in the desert air!"—

এই বিষাদ-সঙ্গীতের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছিল; ইংরাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সুদূরব্যাপিনী,—গৃহসজ্জার সম্পূর্ণ উপযোগী এই বনের কুসুম তাঁহার দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে নাই। তিনি অতি যত্নে, অনেক অর্থব্যয়ে, কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে ঘুরিয়া এই কুসুমলতা গুলি আহরণ করেন এবং তদ্দ্বারা প্রয়োজনমত স্বগৃহের সুষমা বৃদ্ধি করিয়া উদ্বৃত্তাংশ ভিন্ন দেশের বাণিজ্য-স্রোতে ভাসাইয়া দেন।

ইংরাজের উদ্ভিদ-তত্ত্বে এই সমস্ত লতাই orchids, rhododendrons ইত্যাদি নামে অভিহিত।

উচ্চ পাহাড়ের উপরিভাগে আর এক সুন্দর বৃক্ষ জন্মে—সরল। অগণ্য পর্ব্বতে সরল বৃক্ষও অগণন; শিলঙ্ ও তৎসন্নিহিত পর্ব্বতশ্রেণীর উপর সরল ভিন্ন অপর কোন বৃক্ষ নাই বলিলেই হয়—পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, যে দিকে দৃষ্টি ফিরাইবেন, সেই দিকেই গগনস্পর্শী সরল বৃক্ষশ্রেণী আপনার নয়নগোচর হইবে। সরল সরলতার অতি সুন্দর নিদর্শন;—শাখা-প্রশাখার জটিলতা নাই, পত্র পুষ্পের আড়ম্বর নাই, ফল-ভরে অবনতি নাই, কেবল সরলভাবে উর্দ্ধে উঠিতেছে—যেন সর্ব্বলোকবিধাতার চরণস্পর্শ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া অনন্তের পথে উধাও হইতেছে। সরলের এইভাব দেখিয়া সহজেই সাধুর মনের উচ্ছ্বাস প্রবল হয়, তিনি আবেগে কাতর কণ্ঠে সরলকে সুধাইয়া বসেন—

"বল্ রে তরু কা'র উদ্দেশে,
গগন ভেদ ক'রে যা'স উর্দ্ধদেশে,
হ'লি সংসারে এসে কা'র প্রেমে অচল রে?"

অন্যত্র উচ্চ পর্ব্বতের অভিজ্ঞতা আমাদিগের অল্প,—এইরূপ সরল বৃক্ষ অন্য পর্ব্বতে আছে কিনা, বলিতে পারি না; কিন্তু হিমাদ্রিয়ের সমুচ্চ গিরিশৃঙ্গেও যে ইহার অধিষ্ঠান ছিল, অক্ষর

কবি কালিদাসের অমৃতময়ী রচনায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। কবি হিমালয়-বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"কপোলকণ্ডূঃ করিভির্ব্বিনেতুং
বিঘট্টিতানাং সরলদ্রুমাণাম্।
যত্র স্রুতক্ষীরতয়া প্রসূতঃ
সানুনি গন্ধঃ সুরভীকরোতি ॥"

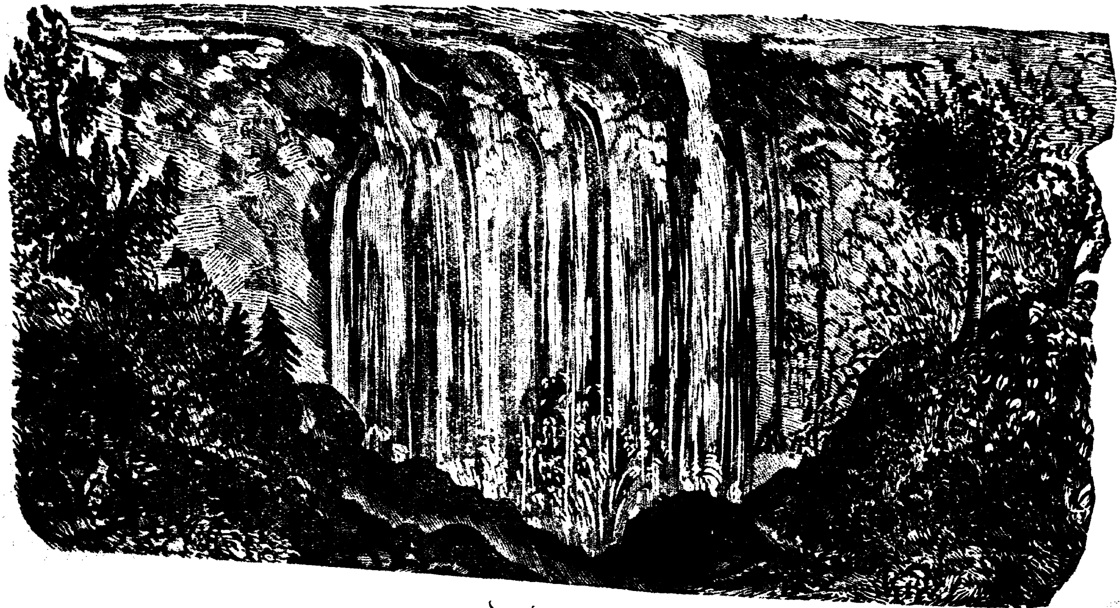
এখানকার সরলবৃক্ষ হইতে করি-কপোল-কণ্ডূয়ন-সঞ্চালিত ক্ষীরধার, কৈ, দেখিতে পাই না; তবে খাসিয়া-কুঠার-কর্ত্তিত সরল-মজ্জা হইতে তৈলময় নির্যাস-ক্ষরণ হইতে দেখিয়াছি এবং এইরূপ নির্যাস-সংযুক্ত কাষ্ঠে অগ্নিহোত্রাদি-ক্রিয়ায় মনোহর সৌরভ সম্ভোগ করিয়াছি। সরলের সারে সাগ্নিকের ক্রিয়া-কাণ্ড, বাস্তবিক, অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় এবং এইজন্যই, বোধ হয়, ইহার অন্যতর নাম ধূপকাষ্ঠ। ইহার প্রধান গুণ—অগ্নিস্পর্শেই জ্বলিয়া উঠে; একারণ পাচকের পাকচুল্লীতে ইহা বিশেষ প্রয়োজন সাধন করে এবং অমান্ধকারে নিঃস্ব পথিকের হস্তে আলোকদানের কার্য্য করে। সরলের এই-রূপ সারভাগ দেশালাইয়ের কাষ্ঠের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইতে পারে; কলিকাতার নবপ্রতিষ্ঠিত দেশালাইয়ের কারখানায় ইহার পরীক্ষা করা সমীচীন বোধ হয়। খাসিয়া-পাহাড়ে সরলবৃক্ষ কল্পতরু বিশেষ;—জ্বালানি কাষ্ঠ হইতে

দ্বার-চৌকাট, চেয়ার-টেবিল, সাজ-সরঞ্জাম, সমস্তই ইহা দ্বারা সাধিত হয়। সরল বৃক্ষের প্রাচুর্য্য স্বাস্থ্যোন্নতিবিধায়ক বলিয়াও দেশীয় মহলে প্রবাদ আছে; ইংরাজ, বোধ করি, এ কথায় বিশ্বাস না করিয়া সহরের অনেক বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিতেছেন; ঐ কারণেই হউক বা লোকাধিক্য বশতঃই হউক, ইদানীং অস্বাস্থ্যের লক্ষণও কিন্তু প্রবল দেখা যাইতেছে।

খাসিয়া শৈলে স্বভাব-সৌন্দর্য্যের নানা উপকরণ বিদ্যমান; গিরিগুহা এবং উষ্ণ প্রস্রবণ তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুহার মধ্যে চেরাপুঞ্জি এবং রূপনাথের গুহারই প্রসিদ্ধি অধিক। কিম্বদন্তী আছে, রূপনাথের গুহাভ্যন্তর দিয়া চীন রাজ্য পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, এবং পুরাকালে একদা চীন সম্রাট, না-কি, অগণ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে এই গুহার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। অনেক গুহার মধ্যে, না-কি, আবার প্রস্তর-খোদিত হিন্দুর দেবমূর্ত্তি আছে। চীন রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হউক, এইরূপ গিরিকন্দর যে অনেক স্থলেই বিলক্ষণ গভীর ও দেবমূর্ত্তির আধার—ইহা অমূলক বোধ হয় না, এবং এই সকল গুহাভ্যন্তরে যে আজ পর্য্যন্ত কত সংসারবিরাগী সাধুপুরুষ সচ্চিদানন্দের সাধনায় নিরত আছেন, কে তাহা সাহস পূর্ব্বক অস্বীকার করিতে পারে? কাছাড়-সীমান্তর্গত পূর্ব্বোল্লিখিত কপিলী নদীর তীরবর্ত্তী সুমীর নামক স্থানে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে; মুঙ্গেরের নিকটবর্ত্তী সীতা-কুণ্ডের ন্যায় ইহার পবিত্রতা সম্বন্ধীয় কোনরূপ প্রসিদ্ধি না

থাকিলেও,বাহ্য লক্ষণে ইহা সীতাকুণ্ডাপেক্ষা বিশেষ হীন বোধ হয় না।

জলপ্রপাত এখানকার প্রাকৃতিক শোভার অন্যতম উপকরণ। এখানে সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রপাত বিস্তর আছে, সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে চেরাপুঞ্জির নিকটস্থ Mausmai Falls এবং শিলং সহরের অনতিদূরস্থ Beadon's Fall দেখিবার সামগ্রী বটে। নগরাজ হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখরদেশে তুষারস্রোত দেখিতে মহা মহিমান্বিত; আর যখন সেই তুহিন-ক্ষেত্রে সোণার বরণ অরুণ-কিরণ প্রতিফলিত হয়, তখন শোভার ইয়ত্তা থাকে না, সে শোভা সন্দর্শনে মানুষ ক্ষণেকের জন্য মুগ্ধ হইয়া ঐশী মহিমায় তন্ময় হইয়া পড়ে। উদয়াস্তের আরক্তিম ছবি অনন্ত আকাশে বিকাশিত, আর সুবিমল রশ্মিতেজে তুষারস্রোত অসংখ্য বর্ণে সুরঞ্জিত—দেখিয়া মানুষ পাঞ্চভৌতিক নশ্বর জগতের কথা ক্ষণেকের জন্য ভুলিয়া যায়, যেন জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গদ্বারে অনন্ত পুরুষের অস্ফুট ছবি দেখিতে পাইয়া উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে, অথবা ভাবের ভরে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিচেতন হইয়া পড়ে। এখানকার জলপ্রপাত গুলি সেরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাবোদ্দীপক না হইলেও, তাহাদিগের মহান্ দৃশ্য বিশ্বকর্ম্মার কৃতিত্বের অপরূপ নিদর্শন, সন্দেহ নাই; পাপ-তাপে অনুতপ্ত মনুষ্য-সমাগম পরিহার করিবার জন্যই যেন তাহারা বিরলে বনের মাঝে আশ্রয় লইয়াছে,আর অতি উচ্চ শিখরভূমি হইতে



মৌস্‌মাই জলপ্রপাত।

অজস্রধারে বারিধারা অতি নিম্নে অবিরাম গতিতে নিপতিত হইয়া যেন মর্ত্ত্যভূমে বিশ্বনিয়ন্তার অপার করুণাবর্ষণের পরিচয় দিতেছে। কিবা অপরূপ স্থান!—চতুর্দ্দিকে গগনভেদী পাহাড়—পাহাড়ে বিশাল বৃক্ষশ্রেণী—নিবিড় জঙ্গলরাশি—নীরব ভীষণতা!—দারুণ নিস্তব্ধতা!—কেবল মধ্যে মধ্যে বনজ বিহঙ্গের কাকলি, বায়ুর স্বন্-স্বন্ শব্দ, আর জলপ্রপাতের অবিরাম ঝম্-ঝম্ রব সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে—প্রায়ই বৃষ্টি, বৃষ্টির সঙ্গে "কড় কড় কড়ে" কুলিশের নাদ দিগন্ত ফাটাইয়া ভীষণতা বৃদ্ধি করিতেছে, আবার সেই শব্দের বিরামেই অধিকতর নিস্তব্ধতা উপস্থিত হইতেছে। প্রকৃতির এই কি-জানি-কেমন ভাব কেবল বুঝিবার সামগ্রী—বুঝাইবার নহে।

উত্তরামেরিকার নায়েগ্রা জলপ্রপাত জল-প্রাচুর্য্যে (volume of water) জগতে অদ্বিতীয়, কিন্তু উহার উচ্চতা (ভৌগোলিক ব্লকম্যান সাহেবের মতে) ১৬২ ফীট মাত্র। অন্যপক্ষে, ইতালীর Cerasoli Falls উচ্চতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু, নায়েগ্রার কথা দূরে থাকুক, ভারতের অনেক জলপ্রপাতের তুলনাতেও জলাংশে উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। খাসিয়া পর্ব্বতের Mausmai Falls ঐরূপ জলাংশে তুচ্ছ হইলেও উচ্চতায় পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বলা যাইতে পারে; ডাক্তার Oldham সাহেবের মতে উহার উচ্চতা ১৮০০ ফীট*

* A treatise on the Geological structure of a portion of the Khási Hills by Thomas Oldham, L. L. D., F. R. S.,

—পতনাবস্থায় প্রস্তরস্তূপে বেগরুদ্ধ হইয়া জলপ্রপাতটি দুই স্তরে বিভক্ত হইয়াছে, সর্ব্বোচ্চ সীমা হইতে মধ্যভাগ ৮০০ ফীট এবং তথা হইতে পুনঃ প্রপাতের নিম্নতল পর্য্যন্ত ১০০০ ফীট। Beadon's Fall ও উচ্চতায় আনুমানিক ৬০০ ফীট হইবে। ভারতের নানা স্থানে নানা প্রপাত আছে;—সকল গুলির জলের পরিমাণ নির্ণয় করা দুরূহ—নিম্নে উচ্চতানুসারে বিদেশীয় বিখ্যাত প্রপাত গুলির তুলনায় কয়েকটীর নামোল্লেখ করা গেল :—

দেশ।	স্থান।	জলপ্রপাত।	উচ্চতা।
ইতালী ...	...আল্‌পস্‌ পর্ব্বতশ্রেণী... ...	...সিরাশোলী ...	২৪০০ ফীট।
ঐ	...ঐ...	...ইভানসন্‌ ...	১২০০ ,,
উত্তরামেরিকা...	ইরাই ও অণ্টেরিও হ্রদের মধ্যে...	নায়েগ্রা... ...	১৬২ ,,
ভারতবর্ষ... ...	পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা...	সরাবতী... ...	৮৮৮ ,,
ঐ	মহাবলেশ্বর পর্ব্বত...	যেন্না...	৬০০ ,,
ঐ	খাসিয়া পর্ব্বত	মৌসমাই......	১৮০০ ,,
ঐ	ঐ	...বীডন্‌স্‌... ...	৬০০ ,,

ভারতের মৌসমাই যেরূপ উচ্চতায় জগতে দ্বিতীয় আসন পাইবার যোগ্য, জলপ্রাচুর্য্যে সরাবতী তদ্রূপ;—নায়েগ্রার নিম্নে একমাত্র উহাকেই গণনা করা যাইতে পারে।*

F. G. S., Superintendent of Geological Survey of India, 1858.

* উপরিলিখিত তালিকা ও তৎসংক্রান্ত বিবরণ ভ্রমপ্রমাদশূন্য নহে। খাসিয়া শৈলে বসিয়া পুস্তকাভাব সত্ত্বেও যাহা সংগ্রহ করা গেল, তাহাই এস্থলে উল্লেখ করা হইল। সহৃদয় পাঠকবর্গ প্রমাণ সহ ভ্রম দেখাইয়া দিলে পরম অনুগৃহীত বোধ করিব।

ভূতত্ত্ব।—খাসিয়া পাহাড়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ স্তর দেখিতে পাওয়া যায়;—কোথাও মৃত্তিকা, কোথাও বালুকা, কোথাও কঠিন প্রস্তরময়। মৃত্তিকার অধিকাংশই লাল-বর্ণ ও লৌহঘটিত; পাহাড়ের অনেক স্থলেই লৌহের আকর আছে, তন্মধ্যে খাইরিম, মৌল্লিম ও চেরাপুঞ্জির আকরই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বে এই সমস্ত আকর হইতে অনেক লৌহ প্রস্তুত হইত; * "বিলাতী লৌহের আমদানীতে খাসিয়া-পর্ব্বতে লৌহ প্রস্তুত করা প্রায় একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে।" †

কয়লা এবং চূণ ‡ এ পাহাড়ে অতি উৎকৃষ্ট এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কলিকাতা এবং তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে

* কলিকাতা যাদুঘরের অধ্যক্ষ (Curator, Asiatic Museum) শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম ভাগ "জন্মভূমি"র চতুর্থ সংখ্যায় ইহার প্রস্তুত-করণ-প্রণালী বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

† "The competition of English iron, with the exhaustion of the supplies of fuel which supported the native furnaces, has almost extinguished the indigenous (iron) industry in the Khási Hills."

—*Assam Administration Report, 1892-93, Part II A, Chapter I, para. 59.*

‡ এস্থলে যেখানে চূণের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, সেই স্থানেই (Lime-stone) চূর্ণ-প্রস্তরের কথা বুঝিতে হইবে। এই প্রস্তর হইতে কিরূপ প্রক্রিয়ায় ব্যবহারোপযোগী চূর্ণ প্রস্তুত হয় এবং খাসিয়া পাহাড়ে

ছাতকের চূণ বলিয়া যাহা পরিচিত, তৎসমস্তই এই খাসিয়া-পাহাড়ে জন্মে; পর্ব্বত-সীমান্তে শ্রীহট্টের অধীন ছাতক নামক স্থান হইতে এই চূণের চালান যায় বলিয়াই বঙ্গে উহা ছাতকের চূণ নামে প্রসিদ্ধ। চেরাপুঞ্জির নিকটস্থ থড়িয়া নামক স্থানে চূণের আকর অধিক এবং ঐ থড়িয়া হইতে রেল-যোগে—৮ মাইলমাত্র—কোম্পানিগঞ্জ পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে নৌকাযোগে ছাতকে যায় ও ছাতক হইতে, প্রয়োজন মত, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। এক চূণের চালানের জন্যই ঐ ক্ষুদ্র রেলপথ টুকুর সূক্ষ্ম রেখা আসাম-সীমায় দেখিতে পাওয়া যায়, নচেৎ এতদিনে উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত। কয়লার খনিও চেরাপুঞ্জি এবং জয়ন্তী পর্ব্বতের দক্ষিণসীমান্তর্ব্বর্ত্তী লাকাডঙ্ নামক স্থানে অধিক। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন, চেরাপুঞ্জিতে ৩,৭২,৯১,৪০০ এবং লাকাডঙে ৩,১৬,৮৪,০৮০ মণ কয়লা আছে। গুণাংশে উৎকৃষ্ট হইলেও, কিন্তু, এ

কোন্ কোন্ খনিজ পদার্থ কিরূপ পরিমাণে ও কোন্ উপায়ে পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ের বিস্তৃত বিবরণ অনুসন্ধিৎসু পাঠক Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. I, Part II. নামক গ্রন্থে দেখিবেন।—ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অর্ণবপোতে ব্যবহারের পক্ষে খাসিয়া শৈলের কয়লাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কয়লা ভারতবর্ষের অন্যত্র কদাপি পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ Records of the Geological Survey, Volumes XXII and XXIII-তে দ্রষ্টব্য।

কয়লা স্থানান্তরে বড় ব্যবহৃত হয় না। আসামের মধ্যে লক্ষ্মীপুর জেলার অন্তর্গত ডিব্রুগড়ের নিকটবর্ত্তী মাকুমের কয়লাই কলিকাতায় গিয়া থাকে। কয়লা-কোম্পানির স্বকৃত রেলপথে এবং ব্রহ্মপুত্র-বক্ষে কলিকাতার বিখ্যাত সরিদ্বিহারী পোতাধ্যক্ষ ম্যাক্নীল কোম্পানির জলপোতে গমনাগমনের সুবিধা থাকায় মাকুমের কয়লা সহজেই কলিকাতায় নীত হয়, কিন্তু খাসিয়া পাহাড়ের কয়লা স্থানান্তরে পাঠাইবার সেরূপ সুগম পথ না থাকায় উহা খাসিয়া-পাহাড়বাসীর ব্যবহারেই পর্য্যবসিত হয়, কচিৎ পাহাড়-সংলগ্ন শ্রীহট্টের বাজারেও বিক্রীত হইয়া থাকে।

এ পাহাড়ে প্রস্তরও নানাবিধ ;—কোথাও আগ্নেয় স্ফটিকময়,কোথাও কেবল শ্লেটে পরিপূর্ণ,কোন ভাগ দৃঢ়,কোন অংশ ভঙ্গপ্রবণ। এখানকার অট্টালিকাদি সমস্তই প্রস্তরে গঠিত, শ্লেটও যথেষ্ট পরিমাণে গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ,পর্ব্বতের সকল স্থান প্রয়োজনীয় পদার্থে পরিপূর্ণ ; অধুনা পাশ্চাত্য রুচিজাত বিলাসিতা চরিতার্থ করা ভিন্ন পর্ব্বতবাসীর পক্ষে পাহাড়ের নিম্নে পদার্পণ করিবার কোন প্রয়োজন ঘটে না।

ঐতিহাসিক।—"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"—এ কথার যৌক্তিকতা ইংরাজের কার্য্যে যেরূপ প্রতীয়মান,অন্যত্র কদাচ তাহা দৃষ্ট হয় ; ইংরাজ বাণিজ্য-ব্যপদেশে সূচ্যগ্র ভূমির স্বত্ব লাভ করিয়া কালসহকারে সসাগরা পৃথিবীর

সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া দাঁড়ান। সমগ্র ভারতাধিকারের মূলেও যে সূত্র, এই ক্ষুদ্র নগণ্য খাসিয়া-পাহাড় অধিকারের মূলেও তাহাই ;—বাণিজ্য-সূত্রেই ইংরাজ এখানে প্রথম পদার্পণ করেন। পূর্ব্বকথিত খাসিয়া-চূণের ব্যবসায় বহুকাল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; খাসিয়ার এই অবাধ বাণিজ্য সুচতুর ইংরাজের চিত্ত আকর্ষণ করিল। তাঁহারা ঐ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিবার উদ্দেশে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে অল্পে অল্পে পাহাড়ে প্রবেশ করিলেন, এবং, পাহাড়ের উপর দিয়া শ্রীহট্ট হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত পথ প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে, নঙ্‌ক্লাওয়ের খাসিয়া-রাজার অনুমতিক্রমে তাঁহারই রাজ্যে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ভারতের যেখানে ইংরাজ, সেই খানেই তাঁহার অনুচর বাঙ্গালী, ন্যূনাধিক, বর্ত্তমান; এই খাসিয়া পাহাড়েও সেই প্রথমাবস্থায় ইংরাজ বাঙ্গালিশূন্য ছিলেন না। বাঙ্গালী অকৃতজ্ঞ জাতি কি না, বাঙ্গালী হইয়া, বলা আমাদিগের শোভা পায় না;—কিন্তু ইংরাজের কার্য্যে যে কোন ত্রুটী লক্ষিত হয়, সহৃদয় ইংরাজ তাহা বাঙ্গালীর শিরে আরোপ করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন না। নঙ্‌ক্লাওয়ে অবস্থানকালে, অত্যল্প কালের মধ্যেই, ইংরাজ ও খাসিয়াতে মনোবিবাদ জন্মে ও ক্রমে তাহা প্রকাশ্য বৈরিতায়, এবং পরিণামে যুদ্ধবিগ্রহে পর্য্যন্ত, পরিণত হয়। ইংরাজের ইতিহাসে ব্যক্ত—বাঙ্গালীর অবৈধাচরণই এই দুর্দ্দৈবের অন্যতম হেতু। হেতু যাহাই হউক, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রেল তারিখে

খাসিয়ারা প্রকাশ্যে অস্ত্রধারণ করে, এবং দুইজন সাহেব ও কতিপয় সিপাহী তাহাদিগের হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। অগত্যা সরকার বাহাদুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, রীতিমত যুদ্ধায়োজন হইল, এবং খাসিয়াগণকে সম্যক্‌রূপে শাসিত ও নিয়মিত করিতে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল কাটিয়া গেল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল লিষ্টার পোলিটিক্যাল এজেণ্ট রূপে প্রথমে উল্লিখিত নঙ্‌ক্লাওয়ে অধিষ্ঠিত হয়েন,—ইংরাজের বিজয়নিশান তদবধি খাসিয়া-শৈলে উড্ডীয়মান। সিভিল ও মিলিটারীর কর্ত্তৃত্বভার, প্রথমতঃ, একাধারেই ন্যস্ত ছিল, পরে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, পূর্ব্বোল্লিখিত চেরাপুঞ্জি সহরে ইংরাজ-রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত ও ঐ সিভিল-মিলিটারীর বিচ্ছেদ সংসাধিত হয় এবং মিঃ হাড্‌সন্ নামক জনৈক সাহেব বাহাদুর ডেপুটী কমিশনর রূপে সিভিলের কর্ত্তৃত্বপদে নিয়োজিত হয়েন। শাসন ও বিচার-ভার তখনও একসূত্রে গ্রথিত ছিল,—এখনও আছে; ফলতঃ, তদবধি প্রায় একই নিয়মে খাসিয়া-শৈলের শাসনযন্ত্র পরিচালিত হইতেছে।

খাসিয়া ও জয়ন্তী পর্ব্বত বর্ত্তমান ইংরাজ রাজত্বে এক-সূত্রে জড়িত হইলেও, পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধীন ছিল, এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন কারণ ও কৌশলে, এতদুভয় পর্ব্বতের অসভ্য রাজারা ব্রিটিশরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। জয়ন্তী পর্ব্বত, প্রথমতঃ, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের অধিকৃত হয়, কিন্তু ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে উহা

সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত ও উহার অধিবাসীবর্গের অত্যাচার প্রশমিত হয় নাই। কিম্বদন্তী আছে, জয়ন্তী-রাজ ইন্দ্রসিংহ তান্ত্রিকমতে শক্তিপূজক ছিলেন এবং তাঁহার উপাস্য দেবী সন্নিধানে নরবলি দিতেন; ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্ববংশীয় কয়েকজন লোক ব্রিটিশ রাজ্যের তিন জন প্রজাকে কৌশলে অপহরণ করিয়া করালবদনা কালী-মন্দিরে ঐরূপ বলি দিয়াছিলেন। স্বয়ং ইন্দ্রসিংহ এই লোমহর্ষণ কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ইংরাজ-কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হয়েন, এবং ইংরাজ-রাজের নিকট বার্ষিক ছয় সহস্র মুদ্রা বৃত্তি ভোগ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ শ্রীহট্টে নির্ব্বিবাদে অতিবাহিত করেন। জয়ন্তী পর্ব্বতে ইংরাজাধিপত্য এই সূত্রেই সূচিত। রাজ্যলাভের সঙ্গে রাজস্ব বৃদ্ধি করা, বোধ করি, রাজধর্ম্মের অন্যতম নীতি; সেই নীতি বা পদ্ধতি অনুসারে ইংরাজরাজ নববিজিত জয়ন্তীরাজ্যের রাজস্ব-বিস্তারে বদ্ধপরিকর হইলেন। জয়ন্তীর অসভ্য প্রজা এতকাল কলাটা, মূলাটা, ছাগলটা, মহিষটা দিয়া তাহাদিগের অসভ্য রাজার মনস্তুষ্টি সাধন ও রাজস্ব পরিশোধ করিয়া আসিতেছিল, অধুনা সুসভ্য ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত আর্থিক করপ্রদানে তাহারা আপনাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত বোধ করিল এবং তাহাদিগের আপন রাজার প্রতি ইংরাজের নির্ম্মম ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া বিদেশী রাজাকে আদৌ কর-দান করিতে অস্বীকৃত হইল। এইরূপ অসভ্য-সমাজে সহসা নূতন কর স্থাপন ও নূতন রাজস্বধারা

প্রবর্ত্তন করিয়া ইংরাজ অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন ; * অন্য দিকে, স্বাস্থ্য-রক্ষানুরোধে, জয়ন্তীর বর্ত্তমান রাজধানী জোবাই গ্রামে তত্রত্য অধিবাসীবর্গের চিরন্তন শবদাহ প্রথাও তাঁহারা প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। এইরূপ নানা কারণে অসভ্য সিণ্টেঙের † মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তাহারা প্রকাশ্যে প্রবলপ্রতাপ ইংরাজের প্রতি বৈরিতা সাধন করিতে প্রস্তুত হইল। সিণ্টেঙের উপদ্রব প্রশমনার্থ ইংরাজ তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা সিদ্ধান্ত করিলেন ; কিন্তু তাহাতে সম্যক্ সফলকাম হওয়া দূরে থাকুক, বরং অধিকতর কুফলই ফলিল।—১৮৬২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে একদা একস্থানে সিণ্টেঙের ধর্ম্মোৎসব চলিতেছিল ; সশস্ত্র নৃত্য করা এই উৎসবের প্রধান পদ্ধতি,—এ ক্ষেত্রেও তাহারা সে পদ্ধতি ভঙ্গ করে নাই, বরং অধিকতর উল্লাসে নৃত্য করিতেছিল। তাহাদিগকে নিরস্ত্র করার আদেশ ইতিপূর্ব্বেই পুলিসের উপর

* "Taxation was introduced without the supervision with which such a measure should have been accompanied. It was followed up by fresh taxation and rumours of other taxes, also by fiscal and other innovations, which tended to disturb the minds of the people—"

—*Extract from an official despatch to the Govt. of Bengal by Major Haughton, the Governor-General's Agent on the North-East Frontier, 1863.*

† জয়ন্তী পর্ব্বতের অধিবাসীগণ সিণ্টেঙ্ নামে অভিহিত।

প্রবল ছিল; পুলিসের পক্ষে সেই আদেশ প্রতিপালন করিবার এই এক সুযোগ মিলিল,—স্বয়ং দারোগা সাহেব সেই নর্ত্তকগণকে নিরস্ত্র করিতে অগ্রসর হইলেন। এতদিন যে বহ্নি ভস্মস্তূপে প্রচ্ছন্ন ছিল, এই সামান্য ফুৎকারে আজ তাহা জ্বলিয়া উঠিল—অসভ্য জয়ন্তীবাসী উন্মত্ত হইল,—জোবাইয়ের পুলিস-থানা জ্বালাইয়া দিল,—ইংরাজের সিপাহি-সৈন্য অবরোধ করিল,—স্বীয় স্বাধীনতা সমুদ্ধারের জন্য প্রাণ-পণে সচেষ্ট হইল। এই বিদ্রোহ-শান্তির জন্য ইংরাজকে যথারীতি যুদ্ধায়োজন করিতে, এবং অসভ্যগণকে সুশাসিত করিবার জন্য বিলক্ষণ বেগ পাইতে, হইয়াছিল। যাহা হউক, অসাধারণ সমরকুশল ইংরাজের নিকট অসভ্য সিণ্টেঙ্ কতদিন মস্তকো-ত্তোলন করিয়া থাকিতে পারে?—বিদ্রোহী দলপতিগণ একে একে বন্দী হইতে লাগিল এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই জয়ন্তীর বর্ব্বরভূমে ইংরাজের শান্তিরাজ্য অক্ষয়-ভাবে সংস্থাপিত হইল। তদবধি খাসিয়া ও জয়ন্তী-পর্ব্বতের সমগ্র প্রজা ইংরাজ-শাসনে শান্ত ও অবনতভাব ধারণ করিয়াছে। চেরাপুঞ্জি পূর্ব্বে ইংরাজাধিকৃত খাসিয়া-পর্ব্বতের রাজধানী ছিল; পরে, অতিরিক্ত বর্ষার প্রকোপে * সরকারী

* শুনা যায়, সমগ্র এসিয়া-ভূমির-মধ্যে চেরাপুঞ্জিতে জলবর্ষণের মাত্রা অধিক। সমগ্র এসিয়া হউক আর না হউক, আসাম-প্রদেশের মধ্যে যে উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সরকারী বিবরণীতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে;—ব্রহ্মপুত্র-অধিত্যকাস্থিত সমস্ত জেলায় যত জলপাত, এক চেরাপুঞ্জিতে প্রায় তত

কার্য্যের অসুবিধা ঘটায়, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উহা বর্ত্তমান শিলঙে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে, আসাম বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটী পৃথক্ প্রদেশরূপে গঠিত হইলে, শিলঙেই সমগ্র আসামের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ পর্য্যন্ত শিলঙেই লাট-মন্দির শোভা পাইতেছে এবং সমগ্র আসামের শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

শাসন-প্রণালী—খাসিয়া-জয়ন্তী-সম্মিলিত সমগ্র ভূ-ভাগ তিনটী প্রধান অংশে বিভক্ত ;—ইংরাজাধিকৃত খাসিয়া-পাহাড়, খাসিয়া-অধিকৃত খাসিয়া-পাহাড় এবং জয়ন্তী-পাহাড়। ইহার প্রত্যেক অংশ আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণায় বিভক্ত ; খাসিয়া-অধিকৃত ভূখণ্ড ও জয়ন্তী-পাহাড়—প্রত্যেকের মধ্যে ২৫টী, এবং ইংরাজাধিকৃত খাসিয়া পাহাড়ে ২৪টী পরগণা। জয়ন্তীর সমগ্রভাগ সম্যক্‌রূপে ইংরাজরাজের অধীন ; খাসিয়া-পাহাড়ের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র সরকার-বাহাদুরের স্বীয় শাসনভুক্ত, অবশিষ্ট সমস্ত স্থান ইংরাজরাজের

দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বস্রষ্টার অদ্ভুত সৃজনকৌশল,—শিলঙ্ এবং চেরা-পুঞ্জির মধ্যে ১৬ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান, অথচ উভয়ের প্রাকৃতিক অবস্থা অনেকাংশে পৃথক্। এক জলবর্ষণ অধ্যায়ে দেখা যায়, চেরাপুঞ্জিতে বৎসরে ৪৭৬ ইঞ্চি জলপাত, পক্ষান্তরে শিলঙে ঐ সময়ের মধ্যে জলপাত ৮৫ ইঞ্চি মাত্র।

স্বহিত সন্ধি-সূত্রে সম্মিলিত খাসিয়া জমিদারগণের অধীন। প্রভুত্ব ও অধিকার-ভেদে এই সমস্ত জমিদারগণ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত; তন্মধ্যে সিএম্, ওহাদাদার, সর্দ্দার এবং লিঙ্‌দোগণের নামই উল্লেখযোগ্য। খাসিয়া-অধিকৃত উল্লিখিত ২৫টী পরগণার মধ্যে ১৫টী সিএম্, একটী ওহাদাদার, পাঁচটী সর্দ্দার এবং চারিটী লিঙ্‌দোগণের অধীনস্থ। মর্য্যাদা-বিষয়ে সিএম্‌গণই সকলের শীর্ষস্থানীয়; বঙ্গভাষাভিজ্ঞ খাসিয়ারা ইহাদিগকে রাজা বলিয়া থাকে,- খাসিয়ার অভিধানে 'সিএম্' কথার মৌলিক অর্থ—জীবন বা আত্মা। এই সমস্ত খাসিয়া রাজারা ইংরাজসরকারকে কোনরূপ রাজস্ব দান করে না; কিন্তু তাহাদিগের অধিকারভুক্ত স্থানসমূহের মধ্যে খনিজ, বনজ বা অন্তবিধ ফসলের অর্দ্ধেক উপস্বত্ব সরকারে সরবরাহ করিয়া থাকে। প্রজাসাধারণের নির্ব্বাচনানুসারে, এবং ইংরাজরাজের অভিমতিক্রমে, সিএম্ বংশ হইতেই ঐরূপ খাসিয়া-শাসনাধিনায়ক নিয়োজিত হইয়া থাকে; স্বাধীন খাসিয়া-ভূমির সর্ব্বত্র ঐ সমস্ত অধিনায়কগণ শাসনকার্য্য পরিচালন করে, কিন্তু নরহত্যা বা তদ্রূপ গুরুতর অপরাধের বিচার ব্রিটিশ ধর্ম্মাধিকরণে নিষ্পন্ন হয়। এইরূপ অপরাধ উপলক্ষে সিএম্ বিশেষের অনবধানতা বা অত্যাচার লক্ষিত হইলে ইংরাজরাজ কর্ত্তৃক তাহাকে স্থানচ্যুত ও ক্ষমতাভ্রষ্ট, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথানুসারে নূতন সিএম্ অভিষিক্ত করা হয়। ইংরাজাধিকৃত খাসিয়া-ভূমে সরকার বাহাদুরের সাধারণ শাসননীতি পূর্ণ-

মাত্রায় চলে না; আইনের মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া অনেক নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—খাসিয়া-পাহাড়ে প্রবাসকালে, খাস পর্ব্বতীয় ভিন্ন, অপর সাধারণকেও অনেকাংশে ঐ সমস্ত ধারার অধীন থাকিতে হয়। জয়ন্তী পাহাড় একটী মহকুমা-রূপে পরিগণিত; শিলঙের ডেপুটী কমিশনার সাহেবের অধীনে তথাকার প্রধান স্থান জোবাইগ্রামে একজন নিম্নপদস্থ সাহেব শাসনকর্ত্তা আছেন, তাঁহারই দ্বারা সমস্ত মহকুমার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

নানাকথা।—অসভ্য খাসিয়ার রাজ্যে ইংরাজের পাদ-স্পর্শে সভ্যতার উপকরণ গঠনোপযোগী মূল ভিত্তির কথা বলা গেল। এখন উহার পথ-ঘাট, ফল-ফসল, জীব-জন্তু প্রভৃতি অভ্যন্তরীণ বিষয় সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলা যাউক, পরে খাসিয়া জাতির কথা উত্থাপন করা যাইবে।—ইংরাজরাজ-প্রসাদাৎ পাহাড়ের সর্ব্বত্র সুপ্রশস্ত ও সুচিক্কণ পথ সকল প্রস্তুত হইয়াছে; পূর্ব্বকথিত ঐতিহাসিক তত্ত্বঘটিত শ্রীহট্ট হইতে কামরূপের পথই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সংস্কৃত,—গগন-ভেদী পর্ব্বতের বক্ষঃ ভেদ করিয়া আরক্তিম রথবর্ত্মের ক্ষীণরেখা দেখিতে বড়ই নয়নাভিরাম। বর্ষার প্রকোপেও পর্ব্বতীয় পথের কোথাও কর্দ্দমের চিহ্ন নাই; বরং বর্ষণান্তে প্রস্তরময় পথের সমধিক শোভা বর্দ্ধিত হয়—বৃষ্টির বেগে আবর্জ্জনা-সমূহ দূরীভূত হইয়া পথ অধিকতর পরিমার্জ্জিত হয়। ফস-লের মধ্যে আলু, কমলা, শশা, আনারস ও সহলাও; হাবে

স্থানে চাউল ও রবিশস্যও কিয়ৎ পরিমাণে জন্মে, কিন্তু তাহা অসভ্য খাসিয়ার অথবা বাক্‌স্ফূর্ত্তিবিহীন গোজাতির উপভোগ্য,—ভদ্রসমাজের পরিপাকও হয় না, মুখেও উঠে না। আলু এখানকার প্রধান সামগ্রী, পূর্ব্বে সুলভও বিলক্ষণ ছিল, এখন রপ্তানির দৌরাত্ম্যে দুর্ম্মূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; ব্যবসাজীবন আগরওয়ালা মহাপ্রভুগণের কৃপায় আসামের সর্ব্বত্র এবং কলিকাতা পর্য্যন্ত উহার চালান যাইতেছে। আনারসের বন হয় ও প্রচুর পরিমাণে জন্মে ; খাসিয়া উহার স্বাদ জানিত না, এখনও বড় কেহ জানে কিনা সন্দেহস্থল ;—সাহেব ও বাঙ্গালীবর্গের জলযোগে গতিবিধি হওয়ায় চতুর খাসিয়া উহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছে এবং বাজারের পসরা সাজাইতেছে। 'সফ্‌লাঙ্' কেশুর-জাতীয় মূলবিশেষ—উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা নাম দিয়াছেন Flemingia vestita ; উহা খাসিয়ার অতি রুচিকর খাদ্য—হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে অসভ্য খাসিয়া উহা অবিরাম চর্ব্বণ করিতেছে, বিরামকালে 'গুয়া-পান' উহার স্থান অধিকার করিতেছে। খাসিয়া পাহাড়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল কমলালেবু। শ্যামল কমলাকুঞ্জে বৃক্ষে বৃক্ষে, শাখায় শাখায়, অগণন সুবর্ণ-বরণ কমলা শোভা পাইতেছে—দেখিতে বড়ই নয়নানন্দবর্দ্ধক। কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহে যে কমলা বিক্রীত হয়, তাহার অধিকাংশই এই খাসিয়া পাহাড়ের ফল। বাল্যকালে বাঙ্গালার গ্রাম্য-সঙ্গীতে শুনিয়াছিলাম—

"ওহে কমলালেবু প্রাণ!

সিলহেটেতে জন্ম তব, বেলেঘাটায় টান।"

কমলা-বিলাসী সুরসিক সঙ্গীতকারের কৃপায় আমাদিগের ধারণা ছিল—এখনও বোধ করি অনেক বাঙ্গালীর এ ধারণা বিদূরিত হয় নাই—যে, শ্রীহট্টেই কমলালেবুর উৎপত্তি। বাস্তবিক তাহা নহে; সঙ্গীতকারেরও বিশেষ অপরাধ নাই—পূর্ব্বে 'ছাতকের চুণ' সম্বন্ধে যে কথা বলা গিয়াছে, শ্রীহট্টের কমলা সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য। শ্রীহট্টসীমান্তেই খাসিয়া-পাহাড়ের যত উৎকৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি-স্থান। কমলারও উৎপত্তি ঐ স্থানে। শ্রীহট্টের প্রধান নদী সুরমা-যোগে উহা কলিকাতায় নীত হওয়ায় সাধারণের ধারণা—শ্রীহট্টেই উহার জন্ম। বৈশাখের বিষম রৌদ্রে সুমিষ্ট কমলার রসাস্বাদ করিতে পারা—খাসিয়া-পাহাড়-প্রবাসী বঙ্গবাসীর প্রবাস-ক্লেশের মধ্যেও এক বিলাস-সুখের উপকরণ! কমলার গুণে আর এক উপাদেয় দ্রব্য জন্মে— মধু। কমলা-মধু অতি পরিষ্কার ও সুমিষ্ট এবং আয়ুর্ব্বেদ মতে পরম উপকারী;—এই উপকার স্মরণ রাখিয়া বিদেশী বাঙ্গালী স্বদেশ গমন কালে কিঞ্চিৎ মধু সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইতে অন্যথা করেন না। এতদ্ভিন্ন পান, সুপারি, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতি দ্রব্যও এ পাহাড়ে পাওয়া যায়; তেজপত্র, লঙ্কা, মরিচ, দারুচিনি প্রভৃতি মসলাও জন্মে। তাম্বূল-চর্ব্বণে ইতর-

ভদ্র আসামবাসী মাত্রেরই বড় রুচি ; সে কারণ আসামের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে পাণ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের ন্যায় এ প্রদেশে পাণের চাষ হয় না ; অধিকাংশ স্থলে নিবিড় সুপারি-কুঞ্জেই পাণ জন্মে ;—উচ্চশির সুপারি-বৃক্ষের অঙ্গ-বেষ্টন করিয়া পর্ণলতা উর্দ্ধমুখী হইয়া কবিকল্পিত "সহকার সনে মাধবী-লতা"র তুলনাকে তুচ্ছ করিতেছে। সহকার-মাধবীর সম্বন্ধ অপেক্ষা পাণ-সুপারির সম্বন্ধ অধিকতর অবিচ্ছিন্ন, সন্দেহ নাই—হিন্দু দম্পতীর অটুট সম্বন্ধের ন্যায় অবস্থান্তর কালেও তাহাদিগের একত্র বাস ! পাণ-সুপারির এই অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সংস্থাপনে বঙ্গবাসী অপেক্ষা আসামবাসীই অধিকতর পরিচয় দিয়াছেন ! এই সংযোগের উপর পর্ণপত্রে চূর্ণ-লেপনের ন্যায় কাক-বিষ্ঠা দর্শনেই তাম্বূল-মোহান্ধ পথিক মনের আবেগে বলিয়াছিলেন,—

"একই গাছে পাণ-সুপারি, একই গাছে চূণ—
মরি ! দেশের কিবা গুণ !"

অসভ্য খাসিয়া সভ্যতর আসামী অপেক্ষা পাণে অধিক-তর রত ; জাগরিত অবস্থায় তাহার মুখে পাণ-চর্ব্বণের বিরাম নাই, ভ্রমণকালে চর্ব্বিত পাণের সংখ্যা দ্বারা ইহারা পথের দূরত্ব নির্ণয় করে।

আসামের সমতল ভূমে প্রায় সর্ব্বত্রই চা-বাগিচা, কিন্তু পাহাড়ে উহা বড় জন্মে না। জয়ন্তী পাহাড়ে একখানি মাত্র

বাগিচা আছে, তাহাতে বার্ষিক ৫০ মণ আন্দাজ চা জন্মে। খাসিয়া-পাহাড়বাসী বাঙ্গালীকে কলিকাতাবাসীর ন্যায় প্রায় সমান মূল্যে চা ক্রয় করিয়া খাইতে হয়। এড়ি, মুগা প্রভৃতি আসামজাত রেশমও এখানে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। খাসিয়া-পর্ব্বতে জঙ্গলের ভাগ নিতান্ত অল্প; রবার (*Ficus elastica*) ভিন্ন অপর মূল্যবান্ বৃক্ষও এখানে অতি অল্প জন্মে। বনের ভাগ অল্প হইলেও, বন্য জন্তুর বড় অভাব নাই; ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী, গণ্ডার, শূকর, মহিষ, শৃগাল, হরিণ—সকলই আছে, কেবল সর্পভয় নাই। বিষাক্ত সর্পের ভাগ অতি অল্পই দেখা যায়, শীতের প্রকোপে তাহারা, বোধ হয়, গহ্বর হইতে মস্তকোত্তোলন করিতে পারে না। সুন্দরবনের ন্যায় মনুষ্য-খাদক ব্যাঘ্রের বিষয়ও এখানে বড় শুনা যায় না; মনুষ্যরক্তের রসাস্বাদন তাহাদিগের ভাগ্যে অল্পই ঘটিয়াছে। খাসিয়া-জমিদারগণ-অধিকৃত ভূখণ্ডে অনেক 'হাতীর মহল' আছে, হস্তী-শিকার দ্বারা এই সকল মহলে অর্থাগমও হইয়া থাকে; এই অর্থের অর্দ্ধেক ইংরাজ-সরকারে এবং অপরার্দ্ধ খাসিয়া-রাজদরবারে যাওয়াই সাধারণ নিয়ম।

খাসিয়া-পাহাড়ের জল-বায়ু প্রায় সর্ব্বত্রই সুন্দর। বর্ষা ও শীত ঋতু ভিন্ন অপর ঋতুর উপলব্ধি বড় হয় না। সাহেবদিগের পক্ষে এ স্থান সর্ব্বাংশে বড়ই প্রীতিপ্রদ, কিন্তু ক্ষুদ্রপ্রাণ বঙ্গবাসীর পক্ষে শীতের মাত্রা বড় বিষম্ বোধ হয়। ষড়্‌ঋতুর সমাবেশ বঙ্গদেশে যেরূপ প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত

হয়, ভারতের অন্যত্র কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। শীতসহিষ্ণু সাহেবের পক্ষে শিলঙের শীত-বর্ষা যেরূপ রুচিকর, বাঙ্গালীর পক্ষে বার মাস সে ভাব বড় ভাল লাগে না। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত একটু বসন্তের লক্ষণ বোধ হয়; বাঙ্গালীর নিকট এই অবস্থাটুকু বড়ই মনোরম। নৈদাঘ তপনের প্রতপ্ত কিরণ-সম্পাতে বঙ্গবাসী এখন বিষম জর্জ্জরিত, কিন্তু তাঁহার প্রবাসী বন্ধু খাসিয়া-শৈলের সুস্নিগ্ধ মারুত-হিল্লোলে পরম পুলকিত, দাসত্ব ও প্রবাস-জনিত অসহ্য কষ্টের মধ্যেও ক্ষণিক সুখসম্ভোগে গৌরবান্বিত। সিমলা, দার্জ্জিলিঙ্‌ প্রভৃতি পাহাড় অপেক্ষা এখানকার শীতের কঠোরতা অল্প, পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতিঃ-প্রভা সমধিক প্রতিভাত; প্রবাসী বাঙ্গালীর বিরহ-বিষাদ ইহাতে অনেকটা তিরোহিত হয়। বঙ্গদেশসুলভ ব্যাধির ভাগও এখানে নিতান্ত অল্প—ম্যালেরিয়ার মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা আদৌ নাই; দুঃখলব্ধান্ন সুস্থ শরীরে ভোজন করিতে পাওয়াও বিদেশীর পক্ষে সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

লোক জন।—বিগত ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের গণনায় দেখা গিয়াছে, সমস্ত খাসিয়া-জয়ন্তী-পাহাড়ে ১,৯৭,৯০৪ জন লোকের বাস; তন্মধ্যে ৬৪,৫২১ জন মাত্র জয়ন্তীর অধিবাসী, বক্রী সমস্তই খাস খাসিয়া-পাহাড়ের, এবং শেষোক্তের মধ্যে ৬,৭২০ জনের বাস রাজধানী শিলঙ্‌ সহরে। বলা বাহুল্য, এই সংখ্যার কিয়দংশ ঔপনিবেশিকগণ কর্ত্তৃক গঠিত।

খাসিয়াগণ সহজে স্বীয় বাসভূমি পাহাড় হইতে নিম্নদেশে অবতরণ করিতে ভাল বাসে না; তবে, সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে, আজ-কাল পাহাড়-সংলগ্ন শ্রীহট্ট,কাছাড়,কামরূপ ও অপরাপর স্থানে দুই-দশ জন কার্য্যসূত্রে যাইতে শিখিয়াছে। লোক-সংখ্যার হিসাব অবধারণে বুঝা যায়, এইরূপে শ্রীহট্টে ৩,৬৭৩, কাছাড়ে ৩১৩, কামরূপে ১৯৫ এবং অন্যান্য স্থানে ৫২০ জন খাসিয়ার বাস হইয়াছে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবলোকনে ইহাদিগকে মঙ্গোলীয় জাতির শাখা বলিয়া অনুমান হয়—বক্র আঁখি, নত নাসা, উচ্চ গণ্ড, ক্ষুদ্র মস্তক, স্থূল ওষ্ঠ—পার্ব্বতজাতি মাত্রই প্রায় এইরূপ। আকৃতি খর্ব্ব, কিন্তু বলিষ্ঠ ও সাহস-ব্যঞ্জক; গুল্‌ফের উপরিভাগ দৃঢ়, মাংসল ও পেশীযুক্ত। পুরুষেরা প্রায়ই শ্মশ্রুবিহীন, কিন্তু গুম্ফযুক্ত। ইহা-দিগের, বিশেষতঃ রমণীগণের, প্রকৃতি সদাই প্রফুল্ল; শারীরিক পরিশ্রম এবং সাহস-পরাক্রম প্রদর্শন করিতে ইহারা কোন অংশে হীনবল নহে; পুরুষেরা কিন্তু বড়ই দ্যূতক্রীড়াসক্ত।

"প্রবাসীর পত্রে" খাসিয়া জাতির নামোৎপত্তি সম্বন্ধে এক হাস্যোদ্দীপক পৌরাণিক কিম্বদন্তীর উল্লেখ করা গিয়াছে। সে কথা নিতান্ত অমূলক হইলেও, মহাভারত, হরিবংশ,মনু-সংহিতা,শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে খস জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সংহিতাকার লিখিয়াছেন, "দ্বিজাতি কর্তৃক পরি-ণীতা সবর্ণা গর্ভসম্ভূত তনয়েরা উপনয়ন-সংস্কারে সংস্কৃত না

হইলে 'ব্রাত্য' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; * * * এইরূপ ব্রাত্যক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক সবর্ণগর্ভজ তনয় দেশবিশেষে সপ্তবিধ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে—'খস' ইহাদিগের অন্যতম।" পরন্তু "খস দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি সংস্কার, যাজন-অধ্যাপন-প্রায়শ্চিত্তাদি ক্রিয়া এবং ব্রাহ্মণদিগের সন্দর্শন অভাবে শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে।" * ভাগবতকারের বিবেচনায় ইহারা অতি পাপিষ্ঠ জাতি; ভগবান শুকদেব কৃত মঙ্গলাচরণ প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—"খস প্রভৃতি পাপিষ্ঠ জাতিরাও ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাদিগের আশ্রয় পাইলে শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে।" † হরিবংশে উক্ত আছে, "ধর্ম্মবিজয়ী মহাত্মা সগর নৃপতি এই খস প্রভৃতি জাতির সহিত বসুন্ধরা জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত দীক্ষিত হইয়া অশ্ব প্রচারণ করিলেন।" ‡ মহাভারতে ইহারা অতি "সমরকর্কশ শূর" বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে; কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে ইহারা কুরুপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, পরে পাণ্ডব পক্ষীয় বীর পাণ্ড্যরাজ কর্ত্তৃক পরাভূত হয়।¶ এতদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, পুরাকালে খস নামে এক পরাক্রমশালী আচারভ্রষ্ট জাতি ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান খাসিয়াগণ সেই

* মনুসংহিতা। ১০। ২০, ২২, ৪৩, ৪৪।

† শ্রীমদ্ভাগবত। ২। ৪। ১৭।

‡ বর্দ্ধমান-রাজ-অনুবাদিত হরিবংশের ১৪শ অধ্যায়।

¶ ঐ ঐ মহাভারত। কর্ণপর্ব্ব, ২০শ অধ্যায়।

খস জাতির বংশধর কি না নিরূপণ করা দুরূহ। আভিধানিকেরা 'খস' অর্থে "ভারতবর্ষের উত্তরস্থ পর্ব্বতীয় জনপদবিশেষ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; ইহাতেও বর্ত্তমান খাসিয়া পাহাড়ই সেই জনপদ কিনা বলা সুকঠিন, বরং নেপালরাজ্যবাসী 'খস'-নামধারী জাতিই প্রাচীন খসজাতির বংশধর বলিয়া অধিকতর অনুমান হয়। সাহস, বলিষ্ঠতা, কার্য্যকুশলতা প্রভৃতি গুণপরম্পরা নেপালী খস ও আসামের খাসিয়া—উভয় জাতির মধ্যেই ন্যূনাধিক দেখা যায়, কিন্তু ক্ষত্রিয়োচিত ভাব বা হিন্দুত্বের লক্ষণ নেপালী খসের মধ্যে যেরূপ প্রত্যক্ষ, সদাচারভ্রষ্টতা আসামী খাসিয়ার মধ্যে ততোধিক প্রতীয়মান। এরূপ অবস্থায় বক্ষ্যমাণ খাসিয়াগণের সহিত পৌরাণিক খসের আভিজাত্য সংস্থাপন করা না করা বুদ্ধিমান পাঠকের বিবেচনাধীন।

গ্রাসাচ্ছাদন।—খাসিয়ারা, সাধারণতঃ, দিবসে দুইবার আহার করে। শুষ্ক মৎস্য তাহাদিগের অতি উপাদেয় খাদ্য; অধিকন্তু, কুক্কুর-মাংস ভিন্ন অপর কোন জন্তুর মাংসই তাহাদিগের অখাদ্য নহে। অসভ্য খাসিয়ার ধারণা,—মনুষ্য-সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই তাহাদিগকে প্রেতাত্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত ঈশ্বর কুক্কুর জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন! এই জন্যই সৃষ্ট জীবের মধ্যে কুক্কুরকুলের প্রতি তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি, কুক্কুরমাংসও সে কারণে তাহার অভক্ষ্য। সভ্যজাতির

পক্ষে যাহা শ্রেষ্ঠ আহার্য্য, খাসিয়ার পক্ষে প্রায়ই তাহা পরিত্যাজ্য;—দুগ্ধই ইহার মধ্যে প্রধান উপকরণ, খাসিয়া দুগ্ধকে বিষ্ঠাবৎ ঘৃণ্য পদার্থ বোধ করে। খাসিয়াগণ অতিশয় পানাসক্ত, কিন্তু আফিম, গঞ্জিকা প্রভৃতি অপর কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে না। তাম্বূল-রাগ-রঞ্জনে খাসিয়া-রমণীর অধরশোভার পরিচয় 'অসমা সুন্দরী' প্রবন্ধেই ব্যক্ত করিয়াছি, ইহার সঙ্গে তাম্রকূট-সেবনের ব্যবস্থাও বড় হীন নহে। তাম্বূলরাগে দশনপংক্তির বিকৃত দশা সমুৎপাদন করা খাসিয়ার অঙ্গশোভার লক্ষণ; একারণ তাহারা ঘৃণা করিয়া বলে,—"কুক্কুর ও বাঙ্গালীর দন্ত অতি ধবল!"

আজ-কাল সুসভ্য খাসিয়া-পুরুষগণ বাঙ্গালীর ন্যায় ধুতি-চাদর ব্যবহার করিয়া থাকেন; পার্থক্যের মধ্যে বাঙ্গালী উষ্ণীষবিহীন, খাসিয়ার মস্তকে উষ্ণীষ বা আধুনিক আপিসার-উপভোগ্য শিরস্ত্রাণ ব্যবহৃত হয়। অসভ্য খাসিয়ার একমাত্র পরিচ্ছদ—আজানুলম্বিত 'আস্তীন'- শূন্য 'আলখাল্লা', তাহার তলদেশে ঝালর ঝলঝলায়মান; মস্তকে পশু-চর্ম্ম-বিনির্ম্মিত অপরূপ টুপি। এইরূপ সাজে সুসজ্জিত খাসিয়া-মূর্ত্তি দেখিতে অতি সুন্দর, যেন ধড়া-চূড়া-পরিহিত ব্রজের গোপাল নন্দদুলাল! রঙ্-বি-রঙ্ 'ডোরা'-বিশিষ্ট বস্ত্রখণ্ডে খাসিয়া-রমণীর কটিদেশ সুবেষ্টিত এবং উভয় স্কন্ধের উপরিভাগে গ্রন্থি-সম্বদ্ধ পৃথক্ বস্ত্রে দেহের উর্দ্ধভাগ আবৃত; বিশিষ্টাগণের মধ্যে ইংরাজি 'জ্যাকেট' প্রবর্ত্তিত;—অবস্থার অনুপাতে বস্ত্রের

ব্যবস্থাও সমধিক সৌষ্ঠবসম্পন্ন। উৎসবোপলক্ষে খাসিয়ানী-গণ স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে,—প্রবালমালা তাহাদিগের প্রিয়তম ভূষণ।

সমাজ ও ধর্ম্ম।—খাসিয়াদিগের জাতিভেদ নাই, কিন্তু সম্প্রদায়-ভেদ আছে। বিগত লোক-সংখ্যা-অবধারণ উপলক্ষে আসামপ্রদেশের Census Superintendent মহানুভব শ্রীযুক্ত E. A. Gait, I. C. S., বাহাদুর, বিশেষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক এই সম্প্রদায় গুলিকে, প্রধানতঃ, চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ;—

১। এক শ্রেণী আপনাদিগকে কোন জীব বা উদ্ভিদের বংশজাত বিবেচনা করে। ইহাদিগের মধ্যে কেহ অলাবু, কেহ সরল-বৃক্ষ, কেহ কর্কট, কেহ বানর, কেহ বা বরাহ-বংশ-সম্ভূত।

২। ব্রিটিশাধিকারের পূর্ব্বে খাসিয়াগণ পর্ব্বতসীমান্তে, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে, দৌরাত্ম্য করিয়া তত্রত্য ইতর-জাতীয়া রমণীগণকে হরণ করিয়া আনিত। এই সকল রমণীর গর্ভে খাসিয়ার ঔরসে যে সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহাদিগের বংশধরেরা 'কূর শিলট' (শ্রীহট্টবাসী), 'কূর ডিখার' (সুসভ্য বাঙ্গালী), প্রভৃতি নামে অভিহিত। আদিম খাসিয়াগণ হইতে ইহাদিগের আকৃতিগত পার্থক্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। খাসিয়াদিগের মধ্যে এইরূপ বংশসম্ভূত লোক বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। পূর্ব্ব-পুরুষের আকৃতি বা প্রকৃতি অনুসারে অনেক বংশ পরিচিত; যথা,—বলিট্ (শ্বেত), ডুক্‌লি (স্বার্থপর) ইত্যাদি।

৪। কাহারও বংশ ব্যবসায়গত, যেমন কামার, বণিক্, প্রভৃতি।*

সভ্যতর খাসিয়া-রমণীগণের মধ্যে সতীত্ব-জ্ঞান অল্পই লক্ষিত হয়। কুমারী অবস্থায় ইহারা অনেকেই পর-পুরুষাসক্ত থাকে এবং, খাসিয়া-পুরুষের অল্পতা নিবন্ধন, কেহ বা আজীবন স্বৈরিতাচরণ পূর্ব্বক দিনপাত করে। সৌভাগ্যের বিষয়, বিবাহিতাবস্থায় কেহ স্বামীর বিশ্বাসঘাতিনী হয় না। বাল্য-বিবাহ ইহাদিগের মধ্যে বিরল,—যৌবনের জোয়ারে আত্ম-বিহ্বল না হইলে প্রায়ই বিবাহ-সংস্কার ঘটে না। এ বিবাহ-পদ্ধতিও বিচিত্র,—পিতা বা অপর অভিভাবক সংঘটিত সামান্য চুক্তি মাত্র; কোনরূপ আদান-প্রদান নাই, কোন উৎসব-আড়ম্বর নাই, আর ধর্ম্মের সঙ্গে ত আদৌ কোন সম্বন্ধই নাই। সভ্যতার উন্মেষে এবং সভ্যতর জাতির সংঘর্ষে, বরযাত্রা এবং আহার-বিহারের ব্যাপার আজকাল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সহযোগে কন্যার ভবনে উপনীত হয়েন এবং পরদিবস প্রাতে পরিণীতা

* Report on the Census of Assam, Part II. Chap, X. para. 285, et. seq.

প্রণয়িনী সমভিব্যাহারে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পত্নী ও তাঁহার কুটুম্বদিগকে যথাসাধ্য ভোজ্যে পরিতুষ্ট করেন। পতি-গৃহে দুই এক দিন অবস্থানের পর নবদম্পতী কন্যার ভবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সুখ-স্বচ্ছন্দে সহবাস করেন। নিঃস্বসংসারে কন্যা মাতৃগৃহেই থাকে, বরও আপন গৃহে থাকে—কেবল স্বেচ্ছা-মত শ্বশ্রূ-ভবনে পত্নীর নিকট যাতায়াত করে; এইরূপে সন্তা-নাদি জন্মিলে, স্বামী পৃথক্ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া পুত্র-কলত্র লইয়া তথায় বাস করে। স্ববংশ-সম্ভূতা কোন রমণীর পাণি-গ্রহণ করিবার প্রথা নাই; পিতামহী, পিতৃস্বসা বা পিতার অপর কোন নিকট আত্মীয়াকে বিবাহ করাও অবৈধ; তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রই বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধন করা চলিতে পারে। উদ্বাহ-বন্ধন যেমন শ্লথ, উহা ভঞ্জনের প্রথা ততোধিক সহজ হওয়াই সম্ভব; সামান্য সাংসারিক বচসায় বা আহারাদির বন্দোবস্তের ত্রুটী ঘটিলেই দাম্পত্য-প্রণয় অন্তর্হিত হয় এবং দুই-দশ জনকে জানাইয়া পাঁচকড়া কড়ি বা পাঁচটী পয়সা পরস্পর বিনিময় করিলেই বিবাহ-বন্ধন চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহার পর পতি-পত্নী আপন ইচ্ছামত পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু "ভাঙা প্রেমে যোড়া লাগে না!"—একবার বিবাহ-বন্ধন ভঙ্গ হইলে আর তাহা-দিগের মধ্যে পরিণয় সম্ভবে না। এ বিবাহে ঘোর স্বেচ্ছা-চারিতা—মূলেও যে সূত্র, অন্তিমেও তাহাই; রূপজ মোহে অভিভূত হইয়া দুই-দশ দিন একত্রে সহবাস, আর সে মোহ

কাটিলেই পরস্পর বিচ্ছেদ, আবার অন্য পুরুষ বা রমণীর প্রতি আসক্তি। সাম্যের ইহা এক সুন্দর নিদর্শন এবং সাম্যবাদী সভ্য সমাজের সুশিক্ষার অতি উৎকৃষ্ট উপকরণ। যে সমাজে এইরূপ সধবা-বিবাহই চলে, বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ থাকা সেখানে বিচিত্র নহে; খাসিয়ার মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত, কিন্তু বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। বহুবিবাহ পূর্ব্বে চলিত, কিন্তু সভ্যতার সূত্রপাতে তাহা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে, তবে পুরুষাপেক্ষা রমণীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় সম্ভ্রান্ত খাসিয়াকে ইতর শ্রেণীস্থ খাসিয়ার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইতেছে।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ,—জীবনের তিনটী প্রধান ঘটনা। খাসিয়ার বিবাহ-পদ্ধতির পরিচয় আমরা প্রথমেই দিলাম; এখন জন্ম-মৃত্যু-ঘটিত অনুষ্ঠানের দুই এক কথা বলাও নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সূতিকা-গৃহে অবস্থান-কালে প্রসূতি অশুচি বলিয়া বিবেচিত হয় না; সকল অবস্থাতেই যে শৌচাশৌচ-জ্ঞান-বিরহিত, প্রসবান্তে অশুচিভাব তাহার অন্তরে উদিত হইতেই পারে না। হিন্দুর শাস্ত্রে বিধান আছে,—

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরং শুচি॥"

জানি না, খাসিয়ার হৃদয়-কন্দরে পুণ্ডরীকাক্ষের পবিত্র স্মৃতি অনুক্ষণ জাগে কি না, তবে তাহার বিবেচনায় সকল অবস্থাই যে

শুচি—ইহা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি। খাসিয়া-শিশুর নামকরণ-প্রথা কিছু অপরূপ বটে। আচার্য্য সুরাপূর্ণ একটী কমণ্ডলু, কিঞ্চিৎ তণ্ডুল-চূর্ণ ও তিন্তিড়ী, এবং একটী ধনু ও তিনটী তীর লইয়া যজমান-গৃহে শুভাগমন করেন; শিশুর মাতামহী বা অপর আত্মীয়া কর্ত্তৃক তখন তিনটী নাম নির্বাচিত হয় এবং আচার্য্য মহাশয় চাউল-চূর্ণ ও তেঁতুলটুকু একখানি কদলী-পত্রে রাখিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তদুপরি তিন বিন্দু সুরা নিক্ষেপ করেন। এই তিন বিন্দু সুরা তিনটী নামের প্রতিরূপ; কমণ্ডলু হইতে যে বিন্দুর পতন-কালে অধিক সময় পর্য্যবসিত হয়, সেই বিন্দু-স্থানীয় নামেই শিশু অভিহিত হইয়া থাকে। আচার্য্য তখন শিশুকে তীর-ধনু প্রদর্শন এবং বিক্রমশালী যোদ্ধা হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। সাম্যতন্ত্রী সভ্য-মহলে আজ-কাল যে প্রথাই প্রবর্ত্তিত হউক, স্ত্রী-পুরুষের কর্ত্তব্য-ভেদ সকল দেশে, সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই ছিল; এই অসভ্য খাসিয়া-সমাজেও সে পার্থক্য শিশুর নামকরণোৎসবেই প্রতীয়মান। আদিম খাসিয়াদিগের মধ্যে ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মৃগয়াদি করা পুরুষের, এবং ঝুড়ি-কুঠার লইয়া গৃহ-কার্য্যে মনোযোগী হওয়া রমণীর, কর্ত্তব্য ছিল; এই নিমিত্ত, নামকরণান্তে, পুত্রকে উল্লিখিতরূপ ধনুর্ব্বাণ এবং কন্যাকে তৎপরিবর্ত্তে কুঠার ও ভারবহনোপযোগী পেটী প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সভ্য খাসিয়াদিগের মধ্যে রায়, সিংহ প্রভৃতি পদবী এবং হরিচরণ, চন্দ্রমোহন অথবা Lewis, Solomon প্রভৃতি নাম প্রবর্ত্তিত

হইতেছে; অসভ্য খাসিয়ার নাম অনেক স্থলে অর্থশূন্য—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সৃষ্ট পদার্থ যাহা নগ্ন চক্ষে উপনীত হয়, খাসিয়াগণ অনেক সময়ে তাহাই পুত্র-কন্যার নাম রাখিয়া থাকে। লিঙ্গবোধার্থ 'উ' ও 'কা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে;—শ্রীমান্ উ আর শ্রীমতী কা। ক্লীবলিঙ্গেও 'কা' প্রচলিত, যথা 'কা দুধ', 'কা ডিঙ্' ইত্যাদি।

হিন্দুর ন্যায় খাসিয়াদিগের মধ্যে শব-দাহ-প্রথা প্রচলিত। কিন্তু এই ঔর্দ্ধদেহিক উৎসবেও কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। মাতৃবংশীয়দিগের দ্বারাই খাসিয়ার সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে—পিতার ধার তাহারা বড় ধারে না। মাতৃবংশীয় কুটুম্বগণ কর্ত্তৃক শব শ্মশানে নীত ও তাহার অগ্নিসংস্কার সাধিত হয়। এই সংস্কারের অগ্রে আত্মীয়বর্গ পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় দিকে দুইটী তীর নিক্ষেপ এবং প্রেতাত্মার উদ্দেশে একটী কুক্কুট-বলি উৎসর্গ করে; খাসিয়ার বিশ্বাস,—আত্মার লোকান্তর গমনকালে ঐ কুক্কুট পথ-প্রদর্শিক হইবে এবং তীর-দ্বয় পথের শত্রু নিপাত করিয়া আত্মার মঙ্গল সাধন করিবে। দাহান্তে ভস্মাবশিষ্ট অস্থি-কঙ্কালাদি একটী মৃণ্ময় পাত্রে সংগ্রহ-পূর্ব্বক যথাকালে বংশপরম্পরাগত সমাধিক্ষেত্রে তাহা প্রোথিত করিয়া স্মৃতি-স্তম্ভ স্বরূপ তদুপরি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করে। পুরুষের জন্য এই প্রস্তর ঊর্দ্ধশির করিয়া এবং স্ত্রীলোকের জন্য ভূমির সহিত সমান্তরালভাবে স্থাপন করাই বিধি। খাসিয়ার এই সমাধি-কাণ্ড হিন্দু সমাজের শ্রাদ্ধোৎসব

স্থানীয়; এই সূত্রে ইহাদিগের মধ্যে বহুদিনব্যাপী নৃত্য-ভোজাদি চলিয়া থাকে। ইহারা আত্মার দেহান্তর-প্রাপ্তি বিশ্বাস করে, কিন্তু মানবাত্মার ক্রমোন্নতি না ঘটিয়া ক্রমাবনতি ঘটাই তাহাদিগের ধারণা; তাহারা বলিয়া থাকে,—"মানুষ মরিয়া কূর্ম্ম, কর্কট, বানর, ভেক প্রভৃতি জীবরূপে পরিণত হইবে।"

খাসিয়া মহলে স্ত্রীজাতিই বংশের চূড়া। মাতৃ-গৃহে অবস্থান কালে, বিবাহিতই হউক আর অবিবাহিতই হউক, খাসিয়া পুরুষের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি তাহার মাতৃবংশেই পর্য্যবসিত হয়। হিন্দুর দায়ভাগ-তত্ত্ব অনেক পণ্ডিতই অবগত আছেন; খাসিয়ার দায়াদ নিরূপণে তাঁহাদিগের কোন গোলযোগ বা ঘটে, এই অভিপ্রায়ে তাহার উত্তরাধিকারীর ক্রমসূত্র এই স্থলে সংযোজিত হইল;—একের অভাবে পরবর্ত্তী আত্মীয় বিষয়াধিকারী বুঝিতে হইবে—মা, মাতামহী, ভগিনী (মাতার কন্যা), ভাগিনেয় (মাতার দৌহিত্র), ভ্রাতা (মাতার পুত্র), মাতুলানী বা মাতৃস্বসা, তৎপুত্রাদি, প্রমাতামহীর ভগিনী ও সন্তানাদি। সহোদরের সন্তানেরা ভিন্ন-বংশীয় বলিয়া পরিগণিত, তাহারা কোন ক্রমেই বিষয়াধিকারী হইতে পারে না। মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুর-ভবনে বাসকালে মৃত্যু ঘটিলে স্ত্রী, এবং স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহার সন্ততি, বিষয়াধিকারী হইয়া থাকে; কেবল পুরুষের আপন বসন-ভূষণ তাহার ভ্রাতা-ভগিনীর প্রাপ্য হয়।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, পিতৃবংশের সহিত সন্তানের কোন সম্বন্ধ নাই, মাতুলবংশ দ্বারাই সে পরিচিত; এমন কি, পূর্ব্বকথিত খাসিয়া রাজার রাজ্যও, মাতার সম্বন্ধে, তদীয় সহোদর বা ভাগিনেয় অধিকার করিয়া থাকে, তাহার আপন পুত্র-কন্যা তাহাদিগের জননীর বিষয় ও বংশ-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়। রমণীর একাধিক পুরুষগ্রহণই এই প্রথার মূল হেতু বোধ হয়;— বর্ত্তমান বাটাবিভ্রাটে ক্ষতি-পূরণের টাকা লইবার জন্য অনেক সাহেবনামধেয় সভ্য পুরুষকে এই কারণে আপন পিতৃবংশ-পরম্পরা অবধারণে ব্যতিব্যস্ত হইতে দেখিয়াছি।

অসভ্য পার্ব্বত জাতির মধ্যে খাসিয়াসমাজেই সভ্যতার উন্মেষ কিছু অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। খৃষ্টীয় পাদরি-পুঙ্গবেরাই এই সভ্যতা-সঞ্চারের বিশিষ্ট হেতু। ধর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় রসাস্বাদনের সঙ্গে খাসিয়াগণ খৃষ্টানগুরুর নিকট ইংরাজ-সমাজগত অনেক প্রণালী শিক্ষা করিয়াছে। বাণিজ্য-ব্যবসায়ে, গৃহাদি-নির্ম্মাণে, স্থপতি-বিদ্যায়, ইহারা অসাধারণ উন্নতি করিয়াছে এবং খাসিয়া খৃষ্টানগণ গৃহ সজ্জার পারিপাট্য-বর্দ্ধনে বিলক্ষণ পটু হইয়াছে। খৃষ্টান গুরুর কৃপায় খাসিয়াগণ অনেকে লেখাপড়াও শিখিয়াছেন, কেহ কেহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই একটা পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইতেছেন, আর কেরাণীগিরির কলম-পরিচালনে অনেকেই দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। ইহাদিগের স্বকীয় কোন লিখিত ভাষা বা পুস্তকাদি ছিল না,—অধুনা এই

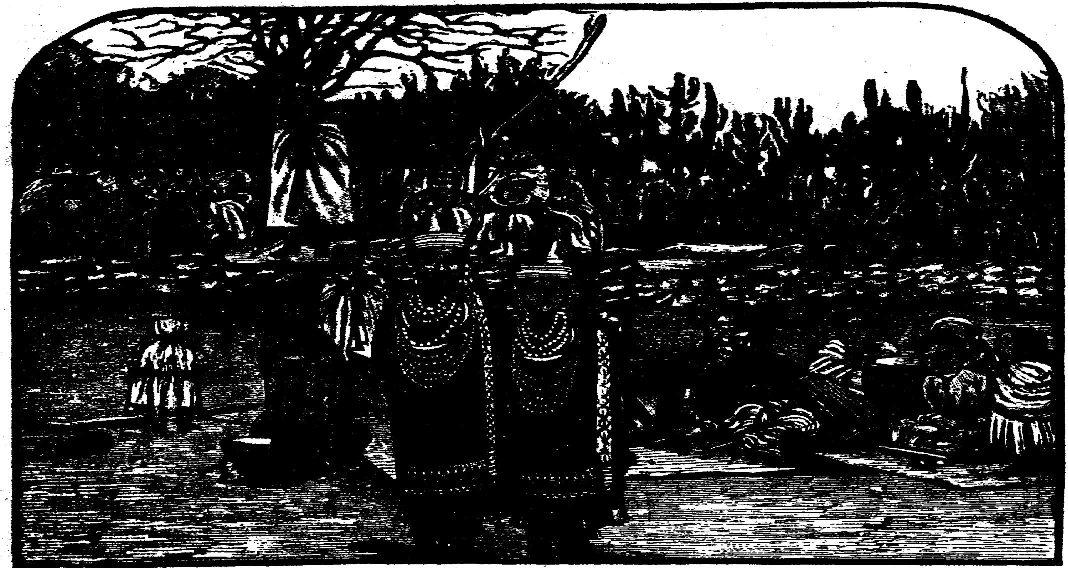
খৃষ্ট গুরুর প্রসাদে ইংরাজি অক্ষরে ইহাদিগের লিখন-প্রণালীও গঠিত হইয়াছে। খাসিয়াদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা সুন্দর ভাবে চলিতেছে, এমন কি, সমগ্র আসাম প্রদেশের মধ্যে খাসিয়া পাহাড়ই স্ত্রী-শিক্ষা-বিস্তারে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া পরিচিত। ইংরাজি সুরে বাইবেল হইতে খাসিয়া ভাষায় অনুবাদিত ভগবৎ-স্তোত্র-সঙ্গীত খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দিরে খাসিয়া রমণীগণ কর্ত্তৃক অতি সুললিত তানে গীত হইয়া থাকে। ফলতঃ, ইংরাজি সমাজের অনেক চিত্রই খাসিয়া-ভবনে দেখা যায়, ইংরাজও সে জন্য খাসিয়াগণকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন। তবে, মূল ধর্ম্ম বিষয়ে ইহারা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, বলা যায় না; প্রয়োজনমত ইহারা এক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে; স্বৈরিতাচরণও সমাজবিরুদ্ধ নহে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণেও সমাজগত পাতিত্য জন্মে না। আজ খৃষ্টান, কাল মুসলমান, পরশ্ব মূলধর্ম্মী প্রেতোপাসক। সাম্যতন্ত্রী ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ ইহাদিগকেই আবার আজ-কাল ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া 'বাহবা' লইতেছেন! স্বর্গীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের উপনিষদুক্ত ব্রহ্মবাদের যে এই বিষম পরিণতি হইবে,—সদাচারভ্রষ্ট খাসিয়া

"ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"

হৃদ্‌গত করিয়া জগতে একেশ্বরবাদের মহিমা ঘোষণ করিবে,— স্বর্গীয় মহাত্মা জীবদ্দশায় ইহা বোধ করি, কখন স্বপ্নেও ভাবেন

নাই! রামমোহন বা কেশবচন্দ্র আজ মরজগতে বিদ্যমান থাকিলে তাঁহাদিগের প্রচারিত এই অভিনব ধর্ম্মের এতাদৃশ অভ্যুত্থান দর্শনে পুলকিত বা বিষণ্ণ হইতেন, একবার চিন্তার বিষয় বটে;—আমরা কেবল "অপরং বা কিং ভবিষ্যতি" ভাবিয়া নীরবে দুই বিন্দু অশ্রুপাত করি। শেলার নিকটবর্ত্তী কয়েক ঘর খাসিয়া বৈষ্ণব বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকে; শ্রীহট্টবাসী কোন চৈতন্য-শিষ্য কর্ত্তৃক ইহাদিগের হৃদয়ে বিষ্ণু-ভক্তি উপচিত হইয়া থাকিবে। শুনা যায়, শান্তিপুরের গোস্বামী প্রভুরাও এই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারে অনেক পরিমাণে উদ্যোগী ছিলেন।

প্রয়োজন বিশেষে বা সভ্য জাতির সংস্রবে খাসিয়াগণের মধ্যে আজ কাল খৃষ্ট, ব্রাহ্ম, মুসলমান বা হিন্দুধর্ম্মের ছায়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে দেখা দিলেও, অধিকাংশ খাসিয়াই এখন পর্য্যন্ত উপদেবতার উপাসক। আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক কোনরূপ দুঃখ উপস্থিত হইলেই উহারা আপনাপন ধারণা মত উপদেবতাবিশেষের প্রকোপকে উহার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করে এবং তাহা প্রসমনার্থ তত্তদ্দেবতার উদ্দেশে কুক্কুট বা তাহার ডিম্ব উৎসর্গ করে। প্রেতপূজার পর্ব্বোপলক্ষে স্থানে স্থানে নৃত্য-ভোজাদি উৎসব হইয়া থাকে, তন্মধ্যে নঙক্রেম্-রাজভবনস্থ উৎসবই বিশেষ উল্লেখযোগ্য; এই উপলক্ষে শিলঙের সম্ভ্রান্ত সাহেবগণও রাজভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। খাসিয়া রমণীর নৃত্য দেখিবার সামগ্রী বটে; সে নৃত্যে



খাসিয়া-রমণীর নৃত্য।

চলনের চটুলতা নাই, কটাক্ষের ভ্রূভঙ্গী নাই, নিতম্বের আস্ফোট নাই,—সে নৃত্য, ধীর, স্থির, গম্ভীর—চরণ চলি চলি চলে না, দেহলতা দুলি-দুলি দোলে না, মুখ-কমল ফুটি-ফুটি ফোটে না!—সে নৃত্য দেখিবার সামগ্রী,—বুঝাইবার নহে। নর্ত্তন-প্রিয় পাঠকের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত সে নৃত্যের সামান্য নমুনা তুলিয়া দিলাম; ইহাতে সকলে সেই অপরূপত্বের, অধিকন্তু খাসিয়া স্ত্রী-পুরুষের আকৃতির, কতক পরিমাণে আভাস পাই-বেন। দেহান্তর-প্রাপ্তি সম্বন্ধে খাসিয়ার বিশ্বাসের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি; পরলোকের ঈষদন্ধকার আবছায়াও তাহার অন্তরাকাশে সময়ে সময়ে উদিত হয়; তবে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল —কোথায় তাহার পরিণতি, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের দৃষ্টিতেও যাহা আজ পর্য্যন্ত ঘোর অন্ধকার, অসভ্য খাসিয়ার মনস্তত্ত্বে আর তাহা কতদূর জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতে পারে? খাসিয়া স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অবাধ বিবাহ-বিচ্ছেদ-প্রথা প্রচলিত থাকিলেও, পত্যন্তর গ্রহণ স্ত্রীজাতির পক্ষে অবৈধ নীতি বলিয়া তাহাদিগের বিশ্বাস। ইহজীবনে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সম্বন্ধ অটুট থাকিলে পরলোকেও তাহারা অবিচ্ছিন্ন প্রেমে বদ্ধ থাকিতে পারিবে, ইহাই তাহাদিগের সমাজ-ধর্ম্মের অন্যতম নীতি। হিন্দুর সহিত খাসিয়ার ধর্ম্ম-নীতির এই টুকু সামঞ্জস্য দেখিয়া কল্পনাকুশল পণ্ডিতগণ হিন্দুকেও খাসিয়ার সদৃশ বর্ব্বর ভাবিবেন কি না, বলিতে পারি না।

শব্দ-শক্তি ও ভাষা।—খাসিয়ার সকল কথাই সংক্ষেপে বলা হইল। তাহার ভাষার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা প্রত্যেক ভাষারই মূলসূত্র উদ্ভাবন করিয়া থাকেন,—পার্ব্বতজাতির ভাষা-মূলে তাঁহারা কতদূর প্রবেশ করিতে পারেন, খাসিয়ার এই ভাষা-প্রসঙ্গে তাহা বিবেচ্য। খাসিয়ার চলিত কথার মৌলিক উপাদান আমরা ত কিছুই অনুমান করিতে পারি না। তবে, শিশুর বাক্যস্ফুরণে 'মা-বাপ' এই দুই মধুময় শব্দের যে প্রথম উদ্গম হয়, খাসিয়ার বুলিতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 'মা'-'পা' এই দুই অস্ফুট উচ্চারণ সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই শুনা গিয়া থাকে,—খাসিয়ার নিকট মা 'মি' রূপে অবতারিত, 'পা' মৌলিক ভাবেই বিদ্যমান, কেবল লিঙ্গভেদার্থ শব্দদ্বয়ের পূর্ব্বে 'কাক্' ও 'উক্' সংযুক্ত হইয়া, যথাক্রমে, 'কাক্‌মি' ও 'উক্‌পা,' দাঁড়াইয়াছে। আর এক কথা;—প্রচলন অভাবে, খাসিয়ার অভিধানে পূর্ব্বে অনেক কথা ছিল না, এখন বঙ্গদেশীয় বন্ধুদিগের সম্মিলনে সেই সকল কথা বাঙ্গালা উচ্চারণেই ব্যবহৃত হইতেছে, কেবল ক্লীবলিঙ্গবোধক 'কা' তাহাদিগের পূর্ব্বে যুক্ত হইয়া থাকে; যথা,—কা দুধ, কা চিনি, কা ঘি, ইত্যাদি। তঙ্কা টঙ্কারূপে, খবর খুবররূপে মৌলিক অবস্থারই পরিচয় দিতেছে। ধ্বনি অনুসারে বিড়ালের নাম কা-মিউ হইয়াছে। এইরূপ দুই-দশ কথা ভিন্ন

খাসিয়ার শব্দ-শক্তি নিরূপণ করা দুরূহ; নিম্নে পাঠকের অবগতির নিমিত্ত কয়েকটী কথা সংযোজিত করিলাম;—

আমি	…	…	ঙ্গা।
তুমি	…	…	ফি।
এখানে	…	…	হাঙ্‌রে।
সেখানে	…	…	সেতাই।
কোথায়	…	…	শেনো।
আইস	…	…	আলে।
যাও	…	…	লাইনো।
রাখ	…	…	বু।
বসা	…	…	শঙ্।
সূর্য্য বা দিন	…	…	কা সিঙি।
রাত্রি	…	…	কা মিট্।
চন্দ্র	…	…	কাব নায়।
শিশু	…	…	খুন্।
কাষ্ঠ	…	…	কা ডিঙ্।
জলাশয় বা জল	…	…	উম্।
গো	…	…	মাশি।
কুকুর	…	…	উ-ক্সেউ।
ব্যাঘ্র	…	…	উ-খ্লা।
ছাগ	…	…	ব্লাঙ্।
সর্প	…	…	উব্ সেন্।

তামাক	... ...	ডুমা।
হুঁকা	... ...	তাঙ্-ডুমা।
মৃত্যু	... ...	লাই-আপ্।
ঈশ্বর	... ...	উ-ব্লেই।

শেষ কথা।—খাসিয়ার খ্যাতি, বোধ করি ভারতের কোন জাতিরই বিদিত নহে। এরূপ জাতির বাসভূমি ও বিস্তৃত কাহিনী বর্ণন করিয়া আমরা কাহারও বিষ-নয়নে পড়িব কি না, জানি না। তবে, সভ্য জাতির সংসর্গে অসভ্য জাতির কিরূপ ক্রমোন্নতি সম্ভবে, খাসিয়ার আখ্যায়িকায় তাহা অনেকটা বুঝা যাইতে পারে, আর সেই উদ্দেশ্যেই আমাদিগের এই প্রবন্ধের অবতারণা।



পরিশিষ্ট।

মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি।

[মুখবন্ধ।—আমাদিগের একজন বন্ধু, সরকারী কর্ম্ম-উপলক্ষে, মণিপুর-যুদ্ধের সময় তথায় উপস্থিত থাকিয়া, স্বচক্ষে সেখানকার যাহা দেখিয়াছেন, ও স্বকর্ণে সেখানকার বিবরণ যাহা শুনিয়াছেন, এই 'দিনলিপি'তে তাহাই লিপিবদ্ধ হইল। এ দিনলিপি অধুনাতন অনেক 'আশমানী লিপি' অপেক্ষা সমধিক প্রীতিপ্রদ হইবে, এরূপ আশা করা যায়। মণিপুর-আন্দোলনের সময়েই তিনি এ সকল কাহিনী লিখিয়া সকলকে চমকিত করিতে পারিতেন; কি কারণে করেন নাই, তাহা বুদ্ধিমান পাঠকের বিবেচ্য। বন্ধুর এই দিনলিপি আমাদিগের প্রবাস-যন্ত্রণার সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সূত্রে জড়িত; এতদিনের পর তাহা আমাদিগের 'অস্ফুট স্মৃতি'র অন্তর্ভুক্ত করা কতদূর সমীচীন হইল, তাহাও সহৃদয় পাঠকের বিবেচনাধীন।]

১।—যাত্রা।

নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল কালচক্রের অপ্রতিহত গতি-প্রভাবে মণিপুরের ভাগ্যাকাশ আজ ঘোর তমসাচ্ছন্ন—উহার সৌভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিতা। কি কুক্ষণে স্বর্গীয় গ্রিমউড সাহেবের সহিত মণিপুর-বীর টীকেন্দ্রজিতের অকপট সখ্য স্থাপিত হইয়াছিল;—কি কুক্ষণে দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্র-বলে স্বর্গীয়

রাজা সুরচন্দ্র রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন ;—কি দারুণ দুর্ব্বুদ্ধি-বশে প্রবলপ্রতাপ ইংরাজরাজের প্রতিনিধি কুইন্টন বাহাদুর সদলে নরপিশাচ মণিপুরীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন! এই অভাবনীয় ঘটনাবশে মণিপুর-রাজ্য আজ শ্মশানে পরিণত—মণিপুরের একটী নগণ্য রাজশিশু আজ প্রতাপবান ইংরাজ-রাজের প্রসাদ-ভিখারী! বিধি-লিপি অখণ্ডনীয় ; বিধিবশে মণিপুরের আজ এই বিষম দশা সমুপস্থিত। এখন আর সে সুরচন্দ্র-টীকেন্দ্রজিৎ নাই,—বৃদ্ধ মন্ত্রী টঙ্গাল জেনারেল নাই,—কুলচন্দ্র-অঙ্গসেনাও নাই ; কেহ বা অনন্ত শান্তির সুস্নিগ্ধ ক্রোড়ে চিরদিনের জন্য শায়িত, কেহ বা পরাধীনতা-শৃঙ্খলের মুর্ম্মুর পেষণে চিরজীবনের জন্য নিষ্পেষিত! সকলই গিয়াছে ; কিন্তু অতীতের পূর্ব্বস্মৃতি এখনও মানুষের মনে সজাগ রহিয়াছে। সেই স্মৃতির কুহকে এখন কত লোকে কত কথাই বলিতেছে,—"মণিপুরের ইতিহাস" বাহির হইয়াছে, "মণিপুর-প্রহেলিকা" প্রকাশিত হইয়াছে, বিবি গ্রিম্‌উডও স্বদেশে গিয়া মণিপুরের পূর্ব্বস্মৃতি দেশ-বিদেশে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই মণিপুর-ব্যাপারে আমরাও ভুক্তভোগী ;—কেরাণীগিরির কঠোর শাসনে কর্ত্তব্যানুরোধে স্বজনত্যাগী। মণিপুরে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগেরও 'মাথার টনক নড়িল' ; পিতামাতা, বন্ধুবান্ধব, প্রাণের প্রিয় পরিজনবর্গকে পরিহার করিয়া প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপরিচিত প্রদেশে

মণিপুরাভিমুখে ছুটিতে হইল। যাইতে যাইতে কি দেখিলাম, কি শুনিলাম—অনেকে জানিতে উৎসুক হইতে পারেন ; সেই ঔৎকণ্ঠ্য আপনোদনের নিমিত্ত আমাদিগের এই দিনলিপির অবতারণা। কিন্তু ইহাতে যেন কেহ বেশী কিছু প্রত্যাশা না করেন ;—কেরাণীর ক্ষীণ মস্তিষ্কে রাজনৈতিক সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রবেশ-লাভই করিতে পারে না—করিলেও, তাহা অপ্রকাশ্য ; আর অলৌকিক বা অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনাও পরাধীনের নির্দ্দিষ্ট দৃষ্টিসীমার অতীত; সুতরাং সহৃদয় পাঠকবর্গ আমাদিগের এই ক্ষুদ্র কাহিনীতে এইরূপ কোন উদ্ভট ব্যাপার প্রত্যাশা করিবেন না। নগ্ন দৃষ্টিতে যে সকল দৃশ্য প্রতিভাত হইয়াছে, লোকলোচনের সমক্ষে তাহাই অনমুরঞ্জিত ভাবে ধারণ করিব। নিরবচ্ছিন্ন মণিপুরের অভ্যন্তরীণ বিবরণ জানা ভিন্ন, মণিপুর-যাত্রার অবান্তর দৃশ্যও পাঠকবর্গ ইহাতে দেখিতে পাইবেন—এই ক্ষুদ্র কাহিনীর ইহাই অন্যতম উদ্দেশ্য।

১২৯৭ বঙ্গাব্দের ২১এ চৈত্র, ইংরাজি ৩রা এপ্রেল, শুক্র-বার, পূর্ব্বাহ্ণ ৮½ ঘটিকার সময়, আমরা আসামের রাজধানী শিলং-শৈল পরিত্যাগ করি। বঙ্গে তখনই নৈদাঘ বায়ু ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে ; কিন্তু শৈলশিখরে তখনও শৈত্যের প্রবল প্রকোপ। প্রাতঃসমীরণের সুশীতলতা অন্তর্ভেদ করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে রণভেরীর অস্ফুট কার-নিক রবও দুর্ব্বল বাঙ্গালী-প্রাণে দারুণ ভীতিসঞ্চার করিল। ইতিপূর্ব্বে কখনও বাটীর বাহির হই নাই, শান্তিরসাস্পদ

জননীর সুস্নিগ্ধ স্নেহক্রোড় হইতে কখনও দূরে যাই নাই,—এখন, চাকরির অঙ্কুরেই, পরীক্ষার চরম সঙ্গমস্থল। একদিকে মা'র সকরুণ নিষেধ-বাণী, অপরদিকে অন্নদাতা প্রভুর অবিচলিত কঠোর আজ্ঞা,—কোন্ দিক্ রাখি, ভাবিয়া ব্যাকুল। সঙ্গে সঙ্গে, সৌভাগ্যক্রমে, হৃদয়ে একটু কর্ত্তব্যজ্ঞানের ছায়া পড়িল; কাপুরুষতার কলঙ্করেখাও ধীরে ধীরে ঘৃণার সঞ্চার করিতে লাগিল; ভাবিলাম, যখন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি, তখন তন্নিহিত সুখ-দুঃখের তারতম্য ভাবিলে কি হইবে?—আর যদি প্রাণের ভয়ে এই প্রবল পরীক্ষাস্থলে পশ্চাৎপদ হই, তবে ইংরাজের ইতিহাসে বাঙ্গালীর কাপুরুষত্ব উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর বর্ণে বর্ণিত হইবে। ভাবনার ফল—দৃঢ়প্রতিজ্ঞা; জীবনের ক্ষণ-ভঙ্গুরত্ব, আত্মার অবিনশ্বরত্ব, প্রভৃতি তত্ত্বকথালোচনে, কখন বা আশার মনোমুগ্ধকর প্রলোভনে, কখন সাহসের স্ফুলিঙ্গ-বিকীরণে জননীর মন ক্রমশঃ স্থির করিতে চেষ্টা করিলাম; এবং অন্তিমে, তাঁহার চরণ-ধূলিরূপ অক্ষয় কবচ ধারণ করিয়া, দুর্গতিহারিণী দুর্গার অভয়-নাম স্মরণ করিয়া, বন্ধু-বান্ধবের সহিত আলিঙ্গন-অভিবাদনাদি সমাপন করিয়া, অশ্বযানে আরোহণ করিলাম। ঘর্ঘর রবে রথ কামরূপ-উদ্দেশে ছুটিল। স্বদেশযাত্রাকালে এই রথধ্বনি হৃদয়ে কত আনন্দবর্দ্ধন করিত, আজ কিন্তু তাহা বিকট রবে বিষম ব্যাকুলতা সঞ্চার করিতে লাগিল। যাহা হউক, সায়াহ্নে যথাকালে আমরা

গৌহাটী পৌঁছিলাম, এবং পরদিবস প্রত্যুষে জলপথে যাত্রা করিলাম।

২।—কামাখ্যা।

ব্রহ্মপুত্রের অবিশ্রান্ত তরঙ্গে গা' ঢালিয়া বাষ্পপোত ঊর্দ্ধমুখে কামরূপ হইতে ডিব্রুগড়াভিমুখে ধাবমান। এই কামরূপে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ কামাখ্যা দেবীর পীঠস্থান.; শক্তি-পূজক কত শত সাধকবর্গ প্রতিনিয়ত এই মহাতীর্থ সন্দর্শনের নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়া দেশ-দেশান্তর হইতে এস্থলে আসিয়া থাকেন। ভূত-ধরিত্রী ভগবতীর যোনিভাগ এইস্থলে নিপতিত হওয়ায়, ইহা পীঠশ্রেষ্ঠ বলিয়া পূর্ব্বাপর প্রসিদ্ধ; মহাভাগবত-কার এ সম্বন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"যোনিঃ পতিষ্যতে যত্র তত্র পীঠোত্তমং পরং।"

কামাখ্যা-দর্শন-লোলুপ তীর্থ-যাত্রীগণ উর্ব্বসী, উমানন্দ, ব্রহ্মকুণ্ড, পাণ্ডুনাথ ও গৌরীশিখর—এই পঞ্চতীর্থে স্নান-পূজাদি সমাপনান্তে যোনিপীঠ দর্শন ও অর্চ্চন করিতে গিয়া থাকেন। গৌরীশিখরের শিখরদেশেই পুণ্যময়ী কামাখ্যা-দেবীর মন্দির বিরাজিত। উক্ত পঞ্চতীর্থের মধ্যে উমানন্দে-রই প্রসিদ্ধি অধিক; সুপ্রসিদ্ধ বারাণসীক্ষেত্রে অন্নপূর্ণা-বিশ্বে-শ্বর দর্শনের সঙ্গে কেদারেশ্বর দর্শন না করিলে কাশী দর্শন যেমন অপূর্ণ থাকিয়া যায়, যোনিপীঠ দর্শনের পূর্ব্বে উমানন্দ

দর্শন না করিলে কামাখ্যা দর্শনও সেইরূপ অপূর্ণ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ, উমানন্দই কামাখ্যা-পীঠ-ভৈরব—ইহঁার মন্দির নদ-রাজ ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বক্ষস্থলে অবস্থিত; প্রবল নদ ব্রহ্মপুত্র অবিচলিত তরঙ্গে প্রবহমান, তাঁহার বক্ষস্থল ভেদ করিয়া উচ্চচূড় উমানন্দ শৈল সমুত্থিত—প্রকৃতির এই সুন্দর বিনোদ-ক্ষেত্র, ভক্ত কি, ঘোর অভক্তের হৃদয়েও ভক্তি উদ্দীপন করিয়া থাকে। উমানন্দ শৈল গৌরী-শিখরাপেক্ষা অনেকাংশে ক্ষুদ্র; উমানন্দের মন্দির ও নাটমন্দির এবং পাণ্ডাদিগের ২।১টী গৃহ ব্যতীত ইহার উপরে অপর কিছুই নাই। গৌরী-শিখরের অপর নাম নীলাচল; গৌরী-শিখরের নাম-করণ নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ—জগন্মাতা গৌরীর গুহ্যাতি-গুহ্য যোনিপীঠ ইহার শিখরদেশে বিরাজিত বলিয়াই এই শৈলের 'গৌরী-শিখর' নাম সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার 'নীলাচল' নাম কেন হইল, নির্ণয় করা দুরূহ। কালিকাপুরাণে মহাদেব বলিয়াছেন,—

"মদ্রূপধারী শৈলস্তু নীল ইত্যুচ্যতে তথা।"

শিবাঙ্গ শুভ্র; তদ্রূপধারী শৈলের নাম, শ্বেতাচল না হইয়া, 'নীলাচল' কেন হইল, তাহার সমস্যা-ভেদ করিতে চেষ্টা করা আমাদিগের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র।* বস্তুতঃ,

* কালিকাপুরাণে জানা যায়—"কুব্জিকা পীঠে সতীর যোনিমণ্ডল পতিত হয় এবং মহামায়া দেবীও সেই যোনিতে বিলীন হইয়া থাকেন।

আমাদিগের ন্যায় অভক্তের নগ্ননেত্রে তাহার শ্বেত বা নীল কোনরূপ বর্ণভেদ উপলব্ধি হয় না। এখানকার একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের নাম "সৌভাগ্যকুণ্ড"; ইহা কামাখ্যা দেবীর ক্রীড়া-সরোবর বলিয়া প্রসিদ্ধ।—বারাণসী-ক্ষেত্রে যেরূপ মণিকর্ণিকায় স্নান-তর্পণাদি সমাপনান্তে বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা দর্শন বিধেয়, নীলাচলে যোনিপীঠ দর্শনের পূর্ব্বে সেই-রূপ এই সৌভাগ্য-কুণ্ডে স্নান-তর্পনাদি কর্ত্তব্য। নিতান্ত দুর্ভাগ্য না হইলে, কিন্তু, আর এ সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান করিতে হয় না; পাপাচারী যাত্রীর পাপপঙ্কে মণিকর্ণিকার জল যেরূপ আবিলতাময় ও পূতিগন্ধপূর্ণ হইয়া থাকে, সৌভাগ্য-কুণ্ডের জল ততোধিক আবিল ও দুর্গন্ধময়। কাশী-বৃন্দাবন প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ প্রভৃতি সাধুগণ মধ্যেও কপটাচারী কামাসক্ত নরপিশাচগণ যেরূপ বিচরণ করিয়া থাকে, বিশ্বেশ্বর-কামাখ্যাদি দেবমূর্ত্তির পার্শ্বেও, বোধ করি, মণিকর্ণিকা-সৌভাগ্যকুণ্ডাদি জলাশয়গুলি সেইরূপ পূতিগন্ধ বিকীরণ করে; সরলপ্রাণ তীর্থযাত্রীগণ তীর্থভূমির এই দুই-রূপ অপবিত্রতা হইতে দূরে থাকিলেই মঙ্গল।

পর্ব্বতরূপী আমাতে (ভগবানে) সেই যোনিমণ্ডল পতিত হইলে এবং তাহাতে যোগনিদ্রা বিলীন হইলে, সেই পর্ব্বত নীলবর্ণ হইয়াছিল।"—আমাদিগের ন্যায় অভক্তের নিকট মূলতত্ত্ব সম্পূর্ণ অন্ধকার থাকিয়া গেল।

নীলাচলে নারিকেল বৃক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। আসামের অন্যত্র নারিকেল বৃক্ষ কদাচ দৃষ্টিগোচর হয়;—বস্তুতঃ, ভদ্র-পরিবারের প্রমোদ-উদ্যানে যত্ন-রোপিত দুই একটী বৃক্ষ ব্যতীত আসামে নারিকেল আদৌ জন্মে না; এরূপ অবস্থায় কামাখ্যা শৈলে এই সুফলের কিরূপে উৎপত্তি ও স্থিতি সংঘটিত হইল, বলা দুরূহ—জগন্মাতার জয়াশীষই ইহার একমাত্র সঞ্জীবনী শক্তি বোধ হয়।

কামাখ্যার মন্দির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দেব-দেবীর মূর্ত্তি নয়নগোচর হয়; এ সমস্ত অতিক্রম করার পর যোনিপীঠ-দর্শন-লাভ হইয়া থাকে। এস্থানটী দিবা-ভাগেও ঘোর তমসাচ্ছন্ন, দীপালোক ভিন্ন তথায় গমন বা দর্শন-অর্চ্চনাদি দুঃসাধ্য। এস্থানে দেবীর কোনরূপ মূর্ত্তিময়ী প্রতিমা নাই; কেবল অবিরাম সলিলোদ্গীরক গহ্বরবিশিষ্ট বৃহৎ শিলাখণ্ড আছে। এই শিলাখণ্ডে পাণ্ডাগণ সিন্দুর-বিলেপন দ্বারা দেবপ্রভা সমুজ্জ্বল করেন, এবং এই গহ্বরেই যোনিমুদ্রা জ্ঞানে যাত্রীগণ অঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন কামাখ্যা-শৈলে বিস্তর তীর্থস্থান আছে, তন্মধ্যে ভগবতী ভুবনেশ্বরীর এবং দশমহাবিদ্যার পীঠস্থানেরই প্রসিদ্ধি অধিক। বারাণসী ধামের ন্যায় কামাখ্যাতেও 'কুমারী'-পূজা দেবীপূজার অন্যতম অঙ্গ; এই কুমারীদিগের দক্ষিণা অধ্যায়ে অনেক সময়ে দরিদ্র যাত্রীদিগকে ব্যতিব্যস্ত

হইতে হয়।—আমাদিগের ভাগ্যে এ যাত্রা অঞ্জলি-প্রদান বা যোনিপীঠ-দর্শন ঘটিল না;—অন্তরীক্ষে জগন্মাতার উদ্দেশে অভিবাদন করিয়া জলযানে আরোহণ করিলাম।

৩।—জলযান।

ইংরাজরাজের কল্যাণে, পূর্ত্তবিভাগের যত্নে, আসামে পথঘাটের নানারূপ 'সুসার' ঘটিয়াছে সত্য; কিন্তু ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দুই এক স্থল ব্যতীত রেলপথের সুবিধা আজি পর্য্যন্ত ঘটে নাই। * সুতরাং আসাম-পরিভ্রমণের নিমিত্ত জলপথ অপেক্ষা সুগম উপায় নাই এবং বাষ্পপোতই এ পথের প্রকৃষ্ট যান। এই বাষ্পপোতেও পূর্ব্বে যাতায়াতের বড় কষ্ট ছিল;—সুবৃহৎ পোত সকল অগণ্য আরোহী ও পণ্যদ্রব্যে পরিপূরিত হইয়া মন্থরগমনে গতায়াত করায়, আসামের সমগ্র সীমা সন্তরণ করিতে মাসাধিক কাল পর্য্যবসিত হইত। কিন্তু এখন আর তাদৃশ ক্লেশ নাই—ডাকবিভাগের কঠোর চেষ্টায় দ্রুতগামী পোতের গতিবিধি ঘটিয়াছে—দুই সপ্তাহের মধ্যে

---

* সম্প্রতি এই অভাব দূর করিবার জন্য একটী বৃহৎ রেলপথের সূত্রপাত হইয়াছে। গৌহাটী হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত রেল-বিস্তারের জন্য সরকার বাহাদুরের সাহায্যে একদল বিলাতী ব্যবসায়ী কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন। কতদিনে ইহার কার্য্য শেষ হইবে, সে তথ্য এখনও সাধারণের অজ্ঞাত।

গোয়ালন্দ হইতে ডিব্রুগড় অনায়াসে যাতায়াত করা যায়। ইহাতে ভ্রমণকারীর কষ্টের লাঘব এবং দূর-প্রবাসীর পক্ষে গৃহের সম্বাদ পাইবার সম্পূর্ণ সুযোগ হইয়াছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের বন্দোবস্তই বিচিত্র;—পূর্ব্বে এই আসাম গমনাগমনের পথে দুই দল ব্যবসায়ী পৃথগ্‌ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সহকারে বাষ্পপোত চালাইতেন, তাহাতে অসচ্ছল আরোহীর ব্যয়সংক্ষেপ ঘটিত; ভদ্রসন্তানগণ অল্লায়াসে আপনাপন 'ইজ্জৎ' বাঁচাইয়াও চলিতে পারিতেন। কিন্তু লভ্যাংশে ব্যাঘাত বুঝিয়া, এখন এই দুই দল সমসূত্রে জড়িত হইয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের ব্যয়ের মাত্রাও কিছু বর্দ্ধিত হইয়াছে। একপক্ষে কিঞ্চিৎ উন্নতিও সংসাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ডাক-জাহাজে দুইটীমাত্র শ্রেণী ছিল; এখন এই যুগল কোম্পানীর আয়োজনে আর দুইটী শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে সুবিধা এই,—মধ্যবিৎ ভদ্রসন্তানকে ইতর আরোহীর সহবাস-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না, অবস্থানুসারে দ্বিতীয় বা মধ্যম (Intermediate) শ্রেণীতে যাতায়াত করিতে পারেন, অথচ অধিক অর্থব্যয় দ্বারা শ্বেতাঙ্গদিগের সংসর্গজনিত লাঞ্ছনা হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কিন্তু, দেশীয় লোকের দুর্ভাগ্যক্রমে, এই দ্বিতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর বর্ত্তমান অবস্থা বড়ই শোচনীয়; ইহার নিমিত্ত পৃথক্ কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই, শৌচাদি-সাধনের জন্য বিশেষ কোন সুবন্দোবস্ত নাই, অবস্থারও আকৃতিগত বিশেষ কোন অঙ্গসৌষ্ঠব নাই—

নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে সমভাবেই কষ্ট সহ্য করিতে হয়। উন্নতির মধ্যে 'পর্দ্দানশিনী' অবস্থা—সহসা দেখিলে 'পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী' বা সরম-সন্ত্রাসিতা সীমন্তিনীর বাসস্থান বলিয়াই ভ্রম জন্মে! দ্বিতীয় শ্রেণীর উন্নতির অপর নিদর্শন—এক ক্যাম্বিশাচ্ছাদিত কোমল-কঠোর খট্টাঙ্গ! মাশুলের হার কিন্তু দ্বিতীয়ে তৃতীয় শ্রেণীর দ্বিগুণ এবং মধ্যমে দেড়গুণ অপেক্ষাও অধিক; ব্যয়ের সঙ্গে বাস-বিধির অনুপাত কতদূর ন্যায্য, এবং ভদ্রপথিকের কতদূর প্রীতিপ্রদ, তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুভব করিতে পারেন।

বাষ্পপোতে গমনাগমনে আর এক কষ্ট—হিন্দু আরোহীর আহারের পক্ষে। ইংরাজবাহাদুরদিগের জন্য "কোপ্তা-কোর্ম্মা, কারি-কাট্‌লেট্‌" প্রভৃতি আহারের বিলক্ষণ আয়োজন হইয়া থাকে, নগণ্য 'নেটিভের' জন্য কিন্তু চিপিটকই চূড়ান্ত বন্দোবস্ত। ইংরাজি-ভাবাপন্ন বা ইদানীং সাম্যবাদী সভ্যগণ অবশ্য বাট্‌লারের 'বাঁটলুয়ে' প্রায়ই প্রসাদ পাইয়া থাকেন; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা সাহেববাহাদুরদিগের উচ্ছিষ্টের সারাংশ। এই আশঙ্কায় অনেক নিষ্ঠাবান্ মুসলমানও ঐ মহাপ্রসাদ-সেবনে সঙ্কুচিত হয়েন; আমাদিগের সহযাত্রী জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ মুসলমান, অর্থের সচ্ছলতা সত্বেও, সদাশয় 'বাট্‌লারে'র সহিত আহারের বন্দোবস্ত করিলেন না। আমরা 'সে কালের লোক'—মনের মলিনতা ঘুচে নাই, সংকীর্ণতার বাহিরে এখনও অগ্রসর হইতে শিখি নাই,

১২

সকলের নিকট সমভাবে প্রসাদ পাইতেও অভ্যস্ত হই নাই—জাহাজে সুতরাং প্রায় অনাহারেই যাইতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, আরোহীদিগের মধ্যে, আমাদিগের ন্যায় অসভ্যের সংখ্যাই কিছু অধিক। বাষ্পপোতের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই অসভ্য-আরোহীবর্গের পরিত্রাণের কি কোন সদুপায় করিতে পারেন না?

৪।—জলপথে।

যাহা হউক, আমাদিগের কষ্টের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বাষ্পপোত আপন গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং যথাকালে, শনিবার সায়াহ্নে, তেজপুর-ঘাটে পোঁছিল। এই তেজপুর আসাম-প্রদেশস্থ কারাগৃহসমূহের কেন্দ্রস্থল, এবং এই স্থানেই এ অঞ্চলের বাতুলাশ্রম। কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী মাত্রকেই এখানকার কারাগৃহে কিছুদিনের জন্য শাস্তিভোগ করিতে হয়; কালক্রমে মণিপুরাধীশ্বর কুলচন্দ্রকেও যে এই কঠিন পরীক্ষায় পেষিত হইতে হইবে—মণিপুর-যাত্রাকালে এ চিন্তা ক্ষণেকের জন্যও মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। তখন নিজের প্রাণের চিন্তাই প্রবল,—কৃষ্ণ-দশমীর দারুণ অন্ধকার দশদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, আমার অন্তরাকাশও ঘোর তমসাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। অনন্ত নৈশাকাশে নক্ষত্র-রাজির ক্ষীণালোক যেমন সেই প্রাকৃতিক অন্ধকারের

ভীষণতা অপহরণ করিতেছিল, আশার সূক্ষ্ম রেখাও তদ্রূপ আমার অন্তরের বিষণ্ণতা অল্পে অল্পে অপসৃত করিতেছিল। এইরূপ শান্তি ও অশান্তির, আশা ও নিরাশার, মধ্য দিয়া সে রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল; দুশ্চিন্তানাশিনী শ্রান্তি-হারিণী নিদ্রাদেবী অলক্ষ্যে কখন্ আমাকে অভয় ক্রোড়ে স্থান দিয়াছিলেন—স্মরণ নাই; প্রাতঃসূর্য্যের নির্ম্মল রশ্মি বাষ্পপোত আলোকিত করায় আমার চেতনা হইল; তখন, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, যথাসম্ভব প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে, প্রভুর আদেশ-পালনে ব্যাপৃত হইলাম।

ক্রমে শীলঘাট, পাণপুর, অতিক্রম করিয়া বাষ্পপোত বিশ্বনাথ-ঘাটে পৌঁছিল। শুনিলাম, অদূরে 'বিশ্বনাথ' মহাদেবের পীঠস্থান। বারাণসীর বিশ্ববিমোহন স্বুবর্ণমন্দিরে 'বিশ্বেশ্বর' বিরাজ করিতেছেন, আর আসামের বিজন বনে 'বিশ্বনাথ' ধূলিশয্যায় * বিশ্বলীলার অস্ফুট স্মৃতি উদ্দীপন করিতেছেন। বিশ্বনাথের অচিন্ত্য লীলা মূঢ় প্রাণী আমরা কি বুঝিব?—অন্তরীক্ষে তাঁহার উদ্দেশে প্রণিপাত পুরঃসর জলপথে অগ্রসর হইতে থাকিলাম। ইহার পরেই তিনটী ঘাটের নাম, যথাক্রমে,—

* "বিশ্বনাথের কোনপ্রকার মন্দির নাই। ইনি প্রায় ছয়মাস ব্রহ্মপুত্র-গর্ভে নিমগ্ন থাকেন। (পূর্ব্বে) রাজা বিশ্বকেতু এই স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া শিবমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন এবং শিবের নাম বিশ্বনাথ রাখিয়া এই স্থানকেও সেই আখ্যা প্রদান করেন। —উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম-ভ্রমণ, ৫৭ পৃষ্ঠা।"

বেহালী-মুখ, ধনেশ্বরীমুখ এবং লোহিত-মুখ। বেহালী ধনেশ্বরী ও লোহিতা নাম্নী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল্লোলিনী ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিতা হওয়ায়, তৎপার্শ্বস্থিত ঘাটগুলির ঐরূপ নাম হইয়াছে। আসামের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া প্রবল নদ ব্রহ্মপুত্র অবিচলিত তরঙ্গে প্রবহমান, পথিমধ্যে ঐরূপ কত ক্ষুদ্র নদীই তাঁহার সেই মহাতরঙ্গে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের প্রাধান্য বশতঃ তত্তৎ নদীর মুখ বলিয়া ঘাট সংস্থাপিত হইয়াছে। উল্লিখিত তিনটী ঘাট অতিক্রম করিয়া আমরা সায়াহ্নে শীকারীঘাটে পৌঁছিলাম। এই স্থানে আমাদিগের জল-পথেরও অবসান হইল। সূর্য্যদেব তখনও একেবারে অদৃশ্য হয়েন নাই,—তাঁহার অস্তোন্মুখী রশ্মিমালা ব্রহ্মপুত্রের লহরমালার সহিত ক্রীড়া করিতেছিল; প্রকৃতির এই চিত্তবিনোদন মোহন দৃশ্য অবলোকন করিতে করিতে আমরা কোম্পানীর বাষ্পপোত হইতে অবতরণ করিলাম। মহাযজ্ঞের মহায়োজন এই স্থান হইতেই আরম্ভ হইতেছিল; প্রভুগণ আবশ্যকমত তাহার কিঞ্চিৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সন্নিহিত সরকারী পোত 'সোণামুখী'তে আশ্রয় লইলেন; আমরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, এবং অবিলম্বে পুনরায় তীরে অবতরণ করিয়া জঠরাগ্নি জুড়াইবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইলাম। বলা বাহুল্য, সে রাত্রি 'সোণামুখী'র অভ্যন্তরেই আমাদিগের শয়নকার্য্য সমাপিত হইল।

সরকারী কার্য্যের সরঞ্জাম স্বতন্ত্র ;—লোক-লস্কর কার্য্য-পরতন্ত্রতায় প্রতিনিয়ত এতদূর লঘুহস্ত যে, অন্যের পক্ষে যাহা এক সপ্তাহে সম্ভব নহে, সরকারী বন্দোবস্তে তাহা এক-দিনেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এই মহাযজ্ঞের আয়োজনে তথাপি কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিল,—৬ই হইতে ১০ই এপ্রিল পর্য্যন্ত আয়োজনের অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন, আমাদিগকে শীকারীঘাটেই অবস্থান করিতে হইল। কেরাণীর পক্ষে কচিৎ লেখাপড়ার কিঞ্চিৎ কারুকার্য্য ভিন্ন অপর কর্ম্ম ছিল না,—ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বক্ষে বিশ্রাম করিতে থাকিলাম এবং নদ-সলিলে সূর্য্য-রশ্মির সুন্দর বীচিক্রীড়া দেখিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। মণিপুরের তদানীন্তন অধীশ্বর কুলচন্দ্র নিজ দুষ্কৃতির ফলা-ফল অনুমান করিয়া ভয়ে ও ভক্তিতে বড়লাট বাহাদুরের নিকট তারযোগে যে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, পাঠকবর্গ অনেকেই তদ্বৃত্তান্ত অবগত আছেন; শীকারীঘাটে অবস্থান কালে—৭ই এপ্রিল তারিখে—সেই তার-সংবাদ আমাদিগের সাহেব-বাহাদুরের হস্তগত হয়। সংবাদে কি ভাব অভিব্যক্ত ছিল, তৎসমালোচনায় এখন প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন।

৫।—অরণ্য মধ্যে।

১১ই এপ্রিল, শনিবার, প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপ-নান্তে আমরা শীকারীঘাট পরিত্যাগ করিলাম। এই স্থান

হইতে জলপথ ঘুচিয়া স্থলপথ আরম্ভ হইল;—এ পথে গো-শকট বা অশ্বপৃষ্ঠ ব্যতিরেকে অপর কোন সুখকর যান নাই—সাহেবেরা অনায়াসে অশ্বপৃষ্ঠে যাইতে লাগিলেন; সাধারণ পথিকের জন্য গো-শকটই বিধি, আমাদিগের জন্য হস্তীর বন্দোবস্ত হইয়াছিল; কিন্তু তৎপৃষ্ঠে দেহ-যষ্টি বন্দী-ভাবে অনুক্ষণ বিলম্বিত করিয়া রাখা বিড়ম্বনা বোধে, সাধ্যানুসারে, পদব্রজেই যাইতে লাগিলাম। ইহাতেও বিড়ম্বনার বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস ঘটিল না; কিয়দ্দূর গমনের পরেই দৈববশে অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, সুতরাং, বলা বাহুল্য, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ জলসিক্ত হইয়া গেল,—হৃদয়াকাশেও একখানা ঘন মেঘ পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রাণটা আকুল করিয়া তুলিল,—ভাবিলাম, প্রবাসীর প্রথম পর্য্যটনেই এই দারুণ পথ-ক্লেশ, না জানি পরিণামে আরও কি বিষম দুর্দ্দৈব প্রচ্ছন্ন আছে। কবিরা, শুনিয়াছি, প্রাবৃটে বিলক্ষণ বিরহাশঙ্কা করিয়া থাকেন; দাম্পত্যপ্রেমের অঙ্কুর এখনও হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয় নাই, সুতরাং প্রণয়িনীর বিচ্ছেদে প্রাবৃটের ধারা কিরূপ যাতনা সঞ্চার করে তাহা অনুভূতির অতীত। কিন্তু প্রিয়-জন-বিরহ যে উহাতে বর্দ্ধিত হয়, এই নৈদাঘ বর্ষণেই তাহার বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিল;—মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন কোথা, আর এই দুরন্ত বৃষ্টির ধারা মস্তকে বহন করিয়া আমি কোন্ অজানিত স্থানে গমন করিতেছি, ভাবিয়া বড়ই অধীর হইলাম। কিন্তু এ অধীরতায় সহানুভূতি

প্রকাশের কোন পাত্র সন্নিকটে নাই, অগত্যা মনের ভাব মনেই বিলীন করিয়া অবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণামে আত্মনির্ভর করিলাম। সৌভাগ্যের বিষয়, এ কষ্ট বড় অধিক-ক্ষণ সহ্য করিতে হইল না,—অপরাহ্ণ এক ঘটিকার সময় আমরা গোলাঘাট পৌঁছিলাম। যথাসম্ভব আহারাদির বন্দোবস্ত সেখানে গিয়াই করা হইল। এ স্থানটী শিবসাগর জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান মহকুমা—সরকারী বে-সরকারী অনেক লোক-জনের বাস ও গতিবিধি আছে, বাঙ্গালীও কয়েক জন আছেন, অতএব অত্যল্প কাল এখানে যাহা অব-স্থান করিতে হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত অসুখে কাটিল না।

১২ই এপ্রিল প্রত্যুষেই আমাদিগকে পুনরায় যাত্রা করিতে হইল। এ দিন রবিবার—সাহেবদিগের বিশ্রাম ও উপাসনার দিন; কিন্তু এই মহদ্ব্যাপারে আর বিশ্রাম নাই, অন্তরে উপাস্য দেবতাকে স্মরণ করিয়া সকলেই বহির্গত হইলেন, এবং যত দিন গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে না পারা যায়, এইরূপ অবিশ্রান্ত ও অবিচলিত ভাবে যাওয়াই স্থির করিলেন। পূর্ব্ব দিবস বৃষ্টিধারায় যেরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, আজ আর সেইরূপ কোন গ্রহবৈগুণ্যের অধীন হইতে হইল না, বরং প্রাতঃসমীরণের সুস্নিগ্ধতা দেহ-মন পুলকিত করিয়া তুলিল। সুখের পর দুঃখ, আর দুঃখের পর সুখ—বিধাতার নিয়মচক্রের পর্য্যায়গত আবর্ত্তন, ইহা না থাকিলে সৃষ্টি চলিত না; পূর্ব্ব দিনের অবসাদের পর আজিকার এই

প্রফুল্লতার উদ্রেক না হইলে আমরাও, বোধ হয়, অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিতাম না। এখানকার পান্থনিবাসগুলির পরস্পর ব্যবধান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় যাত্রা করিয়া অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় আমাদিগের পর্য্যটন সমাপ্ত হইল—তখন আমরা পৌঁছিলাম 'বড় পাথারে।' স্থানটীর নাম শুনিয়া এই পথশ্রান্তির উপরেও আমার একবার প্রত্নতত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিতে বাসনা হইল!—বিজন অরণ্যসমাকীর্ণ দুস্তর পথ সম্মুখে প্রসারিত বলিয়াই কি পূর্ব্বতন পথিকেরা ইহাকে 'বড় পাথার' আখ্যা দিয়া গিয়াছেন? এই সময় আমার মনে নটপ্রবর গিরিশচন্দ্রের সেই মধুর সঙ্গীতটী উদিত হইল, যথাসাধ্য প্রাণ খুলিয়া একবার গাহিলাম—

"(যখন) আস্‌বে তুফান, ভাস'য়ে নে যা'বে।
এ যে অকূল পাথার, নাই (ক) সাঁতার,
কুল-কিনারা আর কি পা'বে?
আগে ধীর তরঙ্গ বয়,
তা'তে হেলে দুলে খেলে আশা-ভয়,
হয় কি না হয়, কতই হয় উদয়;—
ক্রমে জোর ব'য়ে যায়,
দু'কূল ভাসায়,
টানের টানে কে র'বে?"

কোন ক্রমে এস্থানে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন আরও প্রত্যূষে, পাঁচটার সময়, আমরা পুনরায় যাত্রা করিলাম। আজ পর্য্যটনের অবসান হইল—অপরাহ্ন ৫½ ঘটিকার সময়। এ পান্থনিবাসটীর নাম 'বোকাজান'। এতদিন নিজের দৈহিক ও মানসিক সম্বাদ সংক্ষেপে পিতৃ-মাতৃ-গোচরে পত্রের দ্বারা পাঠাইতেছিলাম, আজ তাহাও বন্ধ হইল; অনতি-বিলম্বে একেবারেই বন্ধ হইবে ভাবিয়া তজ্জন্য মনোবেদনা প্রশমিত করিলাম। ক্রমশঃ আমরা ভীষণতর বনের অভ্যন্তর পথে প্রবেশ করিতে লাগিলাম;—১৪ই এপ্রিল প্রাতে ছয় ঘটিকার সময়, 'বোকাজান' পরিত্যাগের পরেই 'নম্ভর বন' আমাদিগের নয়নগোচর হইল। আসামের সকল স্থানই ন্যূনাধিক জঙ্গল ও বনজন্তু সমাকীর্ণ, কিন্তু এই 'নম্ভর বন' অপেক্ষা ভীষণ ও বিপদশঙ্কুল অরণ্যানী, বোধ হয়, আর কোথাও নাই; কেবল বন—নিবিড়, নিস্তব্ধ, নিষ্কম্প—মধ্যে কেবল গো-শকট-গমনোপযোগী ক্ষুদ্র বর্ত্ম নিজ ক্ষীণ তনু রেখাবৎ বিস্তীর্ণ করিয়া রহিয়াছে, আর বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর-ধ্বনি কচিৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভয়-বিহ্বল পথিকের মনে বনজন্তু সমাগমের ভীতি সমধিক বর্দ্ধিত করিতেছে। একাকী এপথে বিচরণ করা অসাধ্য। আমাদিগের সঙ্গে লোক-লস্কর, সাজ-সরঞ্জাম বিস্তর, সুতরাং কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় নাই, তথাপি যতক্ষণ আমরা সেই বিজন অরণ্য-পথে থাকিলাম,

প্রতিক্ষণেই বিপদের আতঙ্ক প্রাণকে ব্যাকুলিত করিয়া রাখিল,—সেই ব্যাকুলতার আবেগে মৃত মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্বরে স্বর মিলাইয়া একবার নীরবে কাঁদিলাম—

"নাথ হে! কোথায় আনিলে—
আনিয়া নিবিড় বনে বুঝি প্রাণে বধিলে।"

৬।—পর্ব্বত-পৃষ্ঠে।

এইরূপে কোনগতিকে বন অতিক্রম করিয়া, দশটার সময়, আমরা ডিমাপুর পৌঁছিলাম এবং তথায় যথাসম্ভব কিঞ্চিৎ আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক পুনরায় মধ্যাহ্ন কালে যাত্রা করিয়া বেলা ৩½ ঘটিকার সময় নিচুগারদে গেলাম। এই স্থানে আমাদিগের পর্য্যটনের দ্বিতীয় অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইল। শীকারিঘাটে পোতবক্ষ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম, এখানে পৌঁছিয়া হস্তি-পৃষ্ঠ হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। অতঃপর পদব্রজে যাওয়াই বিধি;—নাগাপাহাড়ের নিম্নতলে এই 'নিচুগারদ' অবস্থিত, এস্থান হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়,—শকট গমনোপযোগী 'সড়ক' না থাকায় পদব্রজে যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। * সাহেবেরা অবশ্য পর্ব্বতীয় অশ্বে আরো-

* মণিপুর-যাত্রায় গমনাগমনের বিশেষ অসুবিধা ও অর্থনাশ দেখিয়া সরকার বাহাদুর সম্প্রতি এই নিচুগারদ হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত শকট-গমনো-

হণপূর্ব্বক ক্লেশের কতকটা লাঘব সাধন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা সকলের ভাগ্যে সম্ভবে না এবং তদ্দারা যাইতেও হয় সদা সশঙ্কিত ভাবে—অশ্বের কিঞ্চিৎ পদস্খলন হইলেই আরোহীর প্রাণান্ত পর্য্যন্ত সম্ভাবনা। ডিমাপুর এবং নিচু-গারদে পূর্ত্তবিভাগের কয়েকজন কর্ম্মচারী আছেন, আর যেখানে একটু কর্ম্মস্থল—বিশেষতঃ কেরাণীগিরির কীর্ত্তিমন্দির—নিষ্কর্ম্মা বাঙ্গালীর গতিবিধি সেইখানেই, অতএব সেই দূর নির্জ্জন প্রদেশে গিয়াও স্বদেশীয় লোকের মুখাবলোকন করিতে পাইলাম। বাঙ্গালী বিদেশীয় রাজার চক্ষে বড়ই ঘৃণিত পদার্থ বটে,—বাঙ্গালীকে নিস্তেজ, অকর্ম্মণ্য, কাপুরুষ আখ্যা দিতেও কেহ বড় ক্রটী করেন না,—কিন্তু কেরাণীর কলম পরিচালনে বাঙ্গালীর সমকক্ষ, বোধ হয়, কেহই নাই; কেবল রাজা বা রাজপারিষদ লইয়া সমগ্র রাজকার্য্য চলে না,—অধম কেরাণীকুলও সেই রাজকার্য্য পরিচালনের অন্যতম অঙ্গ। কেরাণীর কর্ত্তব্যানুরোধে বাঙ্গালী রণক্ষেত্রে যাইতেও পশ্চাৎপদ নহে; ব্রহ্ম-সমরে, মিশর-যুদ্ধে, বাঙ্গালী ব্যতিরেকে চলে নাই, আর এই মণিপুর-হাঙ্গামাতেও বাঙ্গালী

পযোগী সুন্দর পথ প্রস্তুত করিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই কোহিমা পর্য্যন্ত পথ প্রস্তুত হইয়াছে। শুনা যায়, কালক্রমে এই পথ প্রসারিত হইয়া ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত যাইবে, তবে কতদিনে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা আমরা পরিজ্ঞাত নহি।

একবারে নির্লিপ্ত নহে—এই অধম লেখকও তাহার অন্যতম নিদর্শন। যাহাহউক, বাঙ্গালীর সহিত আলাপ-পরিচয়ে এই বিষম পর্য্যটন-ক্লেশও কতকটা প্রশমিত হইল। সে রাত্রি সেই স্থানেই যাপন করিয়া, পরদিবস প্রাতে, নয়টার মধ্যে কিঞ্চিৎ আহারাদি পূর্ব্বক,আমরা নাগাপাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। ইতিপূর্ব্বে ত্রয়োদশ সংখ্যক বঙ্গ-পদাতিক সৈন্যের (13th Bengal Infantry) এক শত জন নিচুগারদে পৌঁছিয়া আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; আজ তাহারাও আমাদিগের সহিত গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

নিচুগারদ হইতে নাগাপাহাড়ের সরকারী কার্য্যক্ষেত্র, কোহিমা, বিংশতি ক্রোশ মাত্র; কিন্তু পথের উপলময়তা প্রযুক্ত এই টুকু যাইতে, সাধারণতঃ, তিন দিবস লাগে। আমাদিগের প্রয়োজনের, এবং তজ্জনিত আয়োজনের, পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও, দুই দিনের কমে আমরা পৌঁছিতে পারিলাম না;—১৫ই প্রাতে যাত্রা করিয়া ১৬ই সায়াহ্নে আমরা কোহিমা পৌঁছিলাম।

৭।—নাগা জাতি।

কোহিমা নাগা-পাহাড়ের রাজধানী; ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের শেষ নাগা-যুদ্ধের পর এই পার্ব্বত প্রদেশে প্রবলপ্রতাপ ইংরাজ-রাজের জয়পতাকা প্রোথিত হয়। সেই অবধি নাগার

উৎপীড়নও অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে। নাগার উপদ্রবে ইংরাজ-রাজকে অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে—অধিক কি, তাহাদিগের হস্তে অনেক ধন-প্রাণও বিসর্জ্জন দিতে—হইয়াছিল। শুনিতে পাই, এই নাগা-যুদ্ধে সহায়তা সাধন করার জন্যই মণিপুররাজ্যের সহিত ইংরাজ-রাজের সখ্য সংস্থাপিত হয়। কাল-বিপর্য্যয়ে সেই মণিপুরই মিত্রভাব পরিহার করিয়া আজ ইংরাজের পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। নাগা কিরূপ প্রকৃতির লোক—জানিতে, পাঠকের কৌতূহল প্রবল হইতে পারে; অতএব, আমাদিগের অত্যল্পকাল অবস্থিতির মধ্যে তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, এস্থলে তাহাও লিপিবদ্ধ করিলাম।

কিম্বদন্তী আছে, সংস্কৃত 'নগ্ন' শব্দ হইতে নাগার নামোৎপত্তি ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ, নাগারা সচরাচর এরূপ দিগম্বর বেশে বিচরণ করে যে, এই নামকরণের তত্ত্বোদ্ঘাটন বড় বিচিত্র বোধ হয় না। পাহাড়ী বলিয়া 'নগ' শব্দ হইতেও নাগা নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিতে পারে। ইংরাজ-সীমার সরকারী সড়কে গতায়াতকারী নাগারাই কিঞ্চিৎ কৌপীন ব্যবহার করিয়া থাকে, অন্যত্র বৃক্ষপত্রেই তাহাদিগের লজ্জা নিবারিত হয়। শাঁখ, কড়ি, পুঁথি প্রভৃতি পদার্থ নির্ম্মিত হারে তাহারা অঙ্গ-শোভা বর্দ্ধন করে, কর্ণরন্ধ্রে কঠিন প্রস্তর বা কাচখণ্ড অলঙ্কার-রূপে ধারণ করে এবং জানুর নিম্নদেশে ও বাহুর উপরিভাগে বেত্রখণ্ড সজোরে বদ্ধ করিয়া থাকে।

বড়শা, বন্দুক, বল্লম, ধনুর্ব্বাণ, প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ব্যতিরেকে ইহারা পথ চলে না; এই সশস্ত্র সহজ মূর্ত্তি দর্শনেই দারুণ শঙ্কা উপস্থিত হয়,—না জানি, জিঘাংসাপরবশ জটিল মূর্ত্তিতে আরও কি ভয়ঙ্কর বিভীষিকাই উৎপাদন করে।

আসামের প্রায় সর্ব্বত্রই পাহাড়, সুতরাং বিস্তর পার্ব্বত জাতিরও বাস; মিশ্‌মি, মিকির, কুকী, আকা, মিরি, নাগা, খাসিয়া, গারো, প্রভৃতি কত শ্রেণীই যে আছে, এবং তাহা-দিগের প্রত্যেকের মধ্যেও কত সম্প্রদায় ভেদ, তাহা যথাযথ নির্ণয় করা দুরূহ; ইহাদিগের মধ্যে খাসিয়ারা সম্পূর্ণরূপে ইংরাজরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে এবং ইংরাজের শিক্ষা ও দীক্ষা * গুণে অনেক পরিমাণে সভ্য-ভব্য হইয়াছে; গারো এবং নাগারাও অনেক পরিমাণে শান্ত-ভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু বিশেষ চেষ্টা স্বত্বেও শিক্ষা-দীক্ষা এখানে আশানুরূপ ফলোপধায়ক না হওয়ায় তাহাদিগের অসভ্যতা সম্যক্‌ভাবে ঘুচে নাই, সুতরাং তাহাদিগের হিংস্রক প্রকৃতিরও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। অন্যান্য জাতিরা এখনও সম্পূর্ণ অসভ্য, এবং মধ্যে মধ্যে প্রায়ই উপদ্রবপরায়ণ হইয়া উঠে। নাগা-দিগের মধ্যে বিস্তর সম্প্রদায়ভেদ থাকিলেও, ইংরাজ-রাজত্বে আঙ্গামী, রেঙ্‌মা এবং কচা—এই তিন সম্প্রদায়ই প্রধানতঃ বাস করে। ইহাদিগের সমগ্র লোক সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা

* "খাসিয়া-পাহাড় ও খাসিয়া-জাতি" নামক প্রবন্ধ দেখুন।

একরূপ অসম্ভব; আদমসুমারি দ্বারা লোক-সংখ্যা নির্ণয় করিতে গেলে পুনরায় নূতন উপদ্রব উত্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং সুবুদ্ধি ইংরাজ-রাজ পূর্ব্বে তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বিগত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে নাগা-পাহাড়ের তদানীন্তন ডেপুটী কমিশনার সাহেব আনুমানিক ৯৪,৩৮০ জন লোকের বাস স্থির করিয়াছিলেন। সম্প্রতি, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারিতে, যথানিয়মে, লোক গণনা করা হইয়াছিল;—নাগার প্রকৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা যে এখন অনেক পরিমাণে শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ;—এই গণনায় সর্ব্বসমেত ১,২২,৮৬৭ জন লোকের বাস ধার্য্য হইয়াছে; তন্মধ্যে ২৬,৪১৬ জনের বাস নব প্রবর্ত্তিত মককচং মহকুমায়। অতএব, পূর্ব্ব হিসাবের তুলনায়, এবারে ৯৬,৪৫১ জনের বাস পাওয়া যায়। † ইহার মধ্যে অবশ্য নাগা ভিন্ন প্রবাসী অপর দেশীয় লোকের সংখ্যাও মিলিত আছে।

অনেকে অনুমান করেন, পৌরাণিক নাগলোকই এই নাগা পাহাড়। বস্তুতঃ, মহাভারতোক্ত অর্জ্জুনের নির্ব্বাসনকালে এই নাগলোকে আসার এবং নাগরাজদুহিতা উলূপীর পাণিগ্রহণ করার কথা, বর্ত্তমান নাগা-পাহাড়ের ভৌগোলিক অবস্থা বুঝিয়া, নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না।

† Report on the Census of Assam, Part II, Chap II. para. 31.

শুনা যায়, পূর্ব্বোক্ত কোহিমা সহরের ৫।৬ ক্রোশ দূরেই উলূপীর পিত্রালয় ছিল। ওদিকে আমাদিগের গন্তব্য স্থান মণিপুরেই চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত অর্জ্জুন-পুত্র বভ্রুবাহনের রাজধানী ছিল; আলোচ্য বিপ্লবের মূল নায়ক মণিপুরের রাজাও, না-কি, ঐ বভ্রুবাহনের বংশোদ্ভূত। এ হিসাবে মণিপুরই পুরাণোক্ত গন্ধর্ব্বলোক; বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে অর্জ্জুন নিহত হইলে নাগলোক হইতে গন্ধর্ব্বলোকে যে সুড়ঙ্গের দ্বারা অমৃত লইয়া গিয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করার কথা উক্ত আছে, বর্ত্তমান নাগা-পাহাড় ও মণিপুর—উভয় স্থানেই অদ্যাবধি তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। তবে, ঘোর অসভ্য নাগার সহিত সুসভ্য অর্জ্জুনের বৈবাহিক সূত্রে বদ্ধ হওয়ার কথা বড়ই অবিশ্বাসযোগ্য হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত তিন শ্রেণীর নাগার মধ্যে আঙ্গামী নাগারাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপবান্। ইহারা, অসভ্য বর্ব্বর হইলেও, দেখিতে নিতান্ত কদাকার নহে; পার্ব্বতজাতি-সুলভ নাসিকার সমতলতা ভিন্ন ইহাদের আকৃতিগত অন্য কোনরূপ বিকৃতি লক্ষিত হয় না; বরং সবল ও সুদৃঢ় গঠন দুর্দ্দম সাহসব্যঞ্জক বলিয়াই বোধ হয়। ইংরাজ সীমায় ইহাদিগেরই গতিবিধি দৃষ্ট হয়; এবং ইহাদিগেরই অত্যাচারে ইংরাজ-রাজকে সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। ইহারা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গদেশে বাস করে; ইহাদের বাসভবনের কোনরূপ শৃঙ্খলা নাই—কোন কোন পল্লীতে সহস্র

ঘরের বসতি আছে,আবার কোথাও বা বিংশতি ঘরের অধিক দৃষ্ট হয় না। কিন্তু,যেখানেই থাকুক ওযত অল্প-সংখ্যক লোকই বাস করুক, বিপক্ষের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার্থ আপনাপন পল্লীর সীমা দৃঢ়ভাবে দুর্গবদ্ধ করিতে ইহারা ক্রটী করে না;— সীমার চতুর্দ্দিতে গভীর গহ্বর খনন করে,এবং তৎপার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃঢ় প্রাচীর উত্তোলন বা তীক্ষ্ণাগ্র বংশখণ্ড সকল রোপণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কোনরূপ আন্তর্জাতিক শাসন-প্রণালী নাই; জোর-জবরে আত্মসীমা সংরক্ষণ করা এবং প্রাণের জন্য প্রাণ লওয়াই ইহাদিগের শাসনের বা রাজনীতির মূলমন্ত্র। প্রত্যেক দলের এক বা ততোধিক দলপতি থাকে সত্য, কিন্তু তাহার প্রভুত্ব বিশেষ কিছুই লক্ষিত হয় না; ব্যক্তিবিশেষের গুণগ্রাম অনুসারেই লোক-সাধারণ কর্ত্তৃক এইরূপ দলপতি নির্ব্বাচিত হয়, এবং সেইরূপ লোক-সাধারণের অভিমতিক্রমেই তাহার প্রভুত্ব বিনষ্ট হইয়া থাকে। অসভ্য জাতি হইলেও, স্ত্রীজাতির সতীত্বের প্রতি ইহাদিগের সম্যক্ দৃষ্টি আছে; পরদারাসক্তি ইহাদিগের মধ্যে কোন রূপেই মার্জ্জনীয় অপরাধ নহে—পরদারোপগত পুরুষের প্রাণ না লইয়া ইহারা কোনক্রমেই নিরস্ত হয়না। ধর্ম্মজ্ঞান বা পরলোক সম্বন্ধে ইহাদিগের কোনরূপ ধারণা আছে বলিয়া বোধ হয় না; তবে, শুনা যায়, কাহারও কাহারও বিশ্বাস,— ইহজীবনে সদাচারপরায়ণ হইলে মরণান্তে অনন্ত আকাশ-মণ্ডল তাহাদিগের আত্মা নক্ষত্ররূপে জ্যোতি বিকীরণ

করিবে, আর কুপথগামী হইলে প্রেতাত্মা, সপ্তযোনি পরিভ্রমণ করিয়া, মক্ষিকাকারে পরিণত হইবে! কেহ কেহ আবার বলে, জীবনান্তে এই ভৌতিক দেহ সমাধি-ক্ষেত্রে ধূলিরূপে পরিণত হইবে—মাটির শরীর মাটি হইয়া যাইবে—ইহা ভিন্ন আর কি? * বস্তুতঃ, এ শ্রেণীর আত্মা সম্বন্ধীয় কোনরূপ বিশ্বাস নাই বলিলেই হয়।

৮।—অভিযান।

নাগা-কাহিনী-বর্ণনা-প্রসঙ্গে আমরা মূল বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। নাগা ও অন্যান্য পার্ব্বত জাতির সম্যক্ কাহিনী বর্ণনা করিবার এ স্থান নহে; আর অত্যল্প দিন কোহিমা-অবস্থান-কালে সকল বিষয় সংগ্রহ করিবার সুযোগও ঘটে নাই। ১৭ই হইতে ১৯এ এপ্রিল পর্য্যন্ত, সুখে দুঃখে কোন গতিকে, কোহিমাতে দিন কয়েকটা কাটিয়া গেল; এবং ২০এ মণিপুরাভিমুখে অগ্রসর হইবার সমস্ত আয়োজন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। কিন্তু ক্রমেই মনের অবস্থা মলিন হইতে মলিনতর হইয়া উঠিল—মণিপুরের পথে ডাক বন্ধ, সুতরাং এই স্থান হইতে গৃহের সম্বাদ পাইবার পথও একেবারে প্রতিরুদ্ধ হইল। কাল

* *Vide* Hunter's Statistical Account of Assam, Vol. II,

কাহারও আয়ত্ত নহে—সুতরাং আমার মনোবেদনাও বুঝিল না, মণিপুরের ভবিষ্যদ্দশার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করিল না, ইংরাজ-রাজের অর্থনাশের আশঙ্কাও মনোমধ্যে স্থান দিল না—রবিবারের রাত্রি অবসান হইয়া গেল। ২০এ এপ্রিল, সোমবার, প্রাতে, আহারাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য-প্রণালী সমাধান করিয়া, সকলে "কুচ" করিতে প্রস্তুত হইলাম। বেলা ১১ ঘটিকার সময় যাত্রা আরম্ভ হইল।

এক্ষণে, মণিপুর-যুদ্ধের সমগ্র সৈন্য-সংখ্যা জানিতে পাঠকবর্গের কৌতূহল জন্মিতে পারে—এই বিশ্বাসে, নিম্নে তাহার এক তালিকা প্রদত্ত হইল,—

	ইংরাজ অফিসার।	দেশীয় অফিসার।	বীণা-বাদক।	বন্দুক-ধারী।
গূর্খা সৈন্য—				
৪২ নং	১	৪	৪	২০০
৪৩ নং	৫	৮	৮	৪০০
৪৪ নং	৫	৯	৬	৩০০
বঙ্গ পদাতিক—				
১৩ নং	১	২	২	১০০
পুলিস সৈন্য	১	০	০	২০০
সর্ব্বসমেত	১৩	২৩	২০	১২০০

শেষোল্লিখিত পুলিস সৈন্য আমাদিগের পূর্ব্বেই কোহিমা ত্যাগ করিয়াছিল। কোহিমার পরেই কিগুইমা, তৎপরে কুঝেমা; এই

কিণ্ডইমা ও কুঝেমার মধ্যে মেও থানা অবস্থিত। এই মেও থানা পর্য্যন্ত মণিপুরীর দৌরাত্ম্য প্রসারিত হইয়াছিল; এবং তজ্জন্যই, কাপ্তেন ম্যাকিণ্টায়র, পুলিস সৈন্য সহযোগে, ইতি-পূর্ব্বেই তাহা প্রশমিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এবং তৎ-কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক মণিপুরাভিমুখে অগ্রসর হইবার উদ্দেশে আমাদিগের প্রতীক্ষায় কুঝেমায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। মঙ্গলবার, দশ ঘটিকার সময়, আমরা কুঝেমা পৌঁছিয়া ইঁহাদিগের সাক্ষাৎকার লাভ করি, এবং পরদিবস প্রত্যূষে একত্র দলবদ্ধ হইয়া মৈতিফাম অভিমুখে যাত্রা করি। সৈন্যগণের সুশৃঙ্খল সজ্জা ও শ্রেণীবদ্ধ পাদবিক্ষেপ, সঙ্গে সঙ্গে ঐকতান রণবাদ্যের গগনভেদী ধ্বনি, আমার পক্ষে অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার! বাঙ্গালী জীবনে রণসাজে সজ্জিত হইবার কোন আশা নাই—সখের সৈনিক সাজিবার সাধও সরকার বাহাদুর পূর্ণ করেন নাই, কিন্তু এই কেরাণী-জীবনেই, আজ আমার সে রণ-যাত্রার রঙ্গ-রস অভ্যস্ত হইয়া গেল—দুরাশার মধ্য দিয়াও উৎসাহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অলক্ষ্যে জ্বলিয়া উঠিল। সায়াহ্নে, পাঁচ ঘটিকার সময়, আমরা সকলে মৈতিফাম পৌঁছিলাম, এবং পুনরায় পর দিবস প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া যথাকালে কৈরঙ্গে উপস্থিত হইলাম। এতদিন আমরা পথে কোন রূপ উপদ্রবের লক্ষণ দেখি নাই—বিলাস-সুখের বশবর্ত্তী হইয়া বরযাত্রী যাইতেছি, কিম্বা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সমর-বাসনায়

প্রাণ দিতে অগ্রসর হইতেছি, এতদিন তাহা বিশেষ বুঝিতে পারি নাই।

২৪এ এপ্রিল, শুক্রবার, যখন আমরা কৈরঙ্গ হইতে ৬ মাইল দূরস্থিত মৈয়াংথাং শিবিরে পৌঁছিলাম, বিপক্ষদলের ব্যবস্থাদি তখন কতক বুঝা গেল। আশ-পাশ হইতে দুই-দশটা গোলা-গুলিও আমাদিগের উদ্দেশে ছুটিতে লাগিল; আত্মরক্ষার্থ এবং বিপক্ষের ভীতি উদ্দীপনার্থ আমাদিগের পক্ষ হইতেও দুই-পাঁচটা গুলি চলিল। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে, উভয় পক্ষই তখন লক্ষ্যহীন ছিলেন—কাজেই সে গোলা-গুলিতে কাহারও গাত্রভেদ করিতে পারে নাই।

মৈয়াংথাং থানায় কতিপয় মণিপুরী ইতিপূর্ব্বে বিরাজ করিতেছিলেন; লজ্জার বিষয়, প্রবলপ্রতাপ ইংরাজ-সৈন্যের আগমন মাত্রই তাঁহারা পলায়ন করিলেন। সেনা-নায়ক Sir Henry Collett বাহাদুর তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে বিধিমতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই কৃত-কার্য্য হইলেন না। এই থানার পূর্ব্বভাগে, অনতিদূরে, পার্ব্বত ভূমে, মৈয়াংথাং নামধেয় মণিপুরী পল্লী অধিষ্ঠিত। অত্রত্য জনগণ কর্ত্তৃক ইতিপূর্ব্বে টেলিগ্রাফের কর্ত্তা মেলভিল সাহেব নৃশংসভাবে হত হইয়াছিলেন; শুনা গেল, মৃত মেল-ভিলের অপহৃত দ্রব্যাদি ও পূর্ব্বকর্ত্তিত টেলিগ্রাফের তার সকল উক্ত গ্রামের অধিবাসীগণের নিকট এখন পর্য্যন্ত বিরাজ করিতেছিল। এ সম্বাদে বাস্তবিক বড় মর্ম্মবেদনা হয়,

এবং সেই নরপিশাচগণের রক্তপান ব্যতীত জিঘাংসুর মর্ম্ম-জ্বালা প্রশমিত হয় না। কিন্তু, বর্ত্তমান অবস্থায়, সে মর্ম্মজ্বালা নিবারণ অপেক্ষা মূল পাপীর প্রায়শ্চিত্ত-বিধান করাই অধিক প্রয়োজন; সুতরাং সে পক্ষে বিশেষ মনোযোগ না করিয়া ঐ গ্রাম দগ্ধ করিবার আদেশ দেওয়া হইল—স্বহস্তে অপরাধীর শিরশ্ছেদ না করিয়া প্রকারান্তরে তাহার প্রাণ বিনাশের উপায় করা হইল। হিন্দুর হৃদয়ে এপ্রকার বন্দোবস্ত অসমীচীন বোধ হইতে পারে,—এক বা দশ জনের দোষে সমগ্র দেশ ছারখার করা মর্ম্মভেদীও হইতে পারে; কিন্তু, রাজনৈতিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহাপেক্ষা সুশাসন, বোধ হয়, সম্ভবপর নহে,—প্রকৃত পাপীর পরিচয়াভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু সংক্ষুব্ধ করিবার ইহাপেক্ষা সহজ উপায়ও, বোধ হয়, আর নাই। যাহাহউক, এ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করা আমাদিগের সীমার বহির্ভূত; ঘটনার ধারাবাহিক অবস্থা যথাযথ লিপিবদ্ধ করাই আমাদিগের কার্য্য—তাহার সমালোচনার ভার সুচতুর পাঠকের হস্তে। অতঃপর, মণিপুরাধীশ্বর কুলচন্দ্রের নিকট ঘোষণাপত্র প্রেরিত হইল যে,—মণিপুর-রাজ্য মধ্যে তখন পর্য্যন্ত ইংরাজ-রাজের যে সমস্ত প্রজা বন্দী ছিল, তাহাদিগের জীবন-রক্ষা-পক্ষে তিনিই স্বয়ং ইংরাজ সমীপে বাধ্য, এবং তাহাদিগের নিরাপদের উপরেই ইংরাজ-হস্তে কুলচন্দ্রের নিষ্কৃতি নির্ভর করে। এ ঘোষণা ইংরাজ-রাজের অকৃত্রিম প্রজাবাৎসল্যের পরিচয়; বাস্তবিক, এ

আদেশ ঘোষিত না হইলে জিঘাংসাপরায়ণ মণিপুরীর হস্তে তদানীন্তন বন্দী ইংরাজ-প্রজাগণের কি পরিণাম ঘটিত, অন্তর্যামী বিধাতাই বলিতে পারেন। কুলচন্দ্রের কি পরিমাণে নিষ্কৃতি ঘটিয়াছে, পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন; তবে, তিনি যে ইংরাজ-রাজের ঐ আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন করিয়াছিলেন—ইংরাজ-কর্ম্মচারীগণের কায়মনে যত্ন ও পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন—এ সত্য কাহারও অবিদিত নাই।

২৫ এ এপ্রিল, শনিবার, আমরা কৈতিমাবি শিবিরে পৌঁছিলাম। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজ-রাজের সহিত যুদ্ধ-সাধে মণিপুরী সৈন্য, বোধ করি, যথাসাধ্য আয়োজন করিয়াছিলেন; ইংরাজের প্রবল প্রতাপ, সম্ভবতঃ, তখন পর্য্যন্ত অসভ্য মণিপুরী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তাই শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় কাষ্ঠবিড়ালীর সাহায্যে অপার জলধি পার হইবেন, ভাবিয়াছিলেন! কিন্তু হায়! সে অপরিণামদর্শিতার ফল অচিরেই ভোগ করিতে হইল,—বংশপরম্পরাগত স্বাধীন রাজ্য ইংরাজ-রাজের হস্তে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিতে হইল,—ধনেপ্রাণে নিধন পাইল,—[redacted] গৃহের গৃহিণী পথের কাঙালিনী হইয়া দাঁড়াইল!

* ইংরাজ-রাজ অবশ্য এত অত্যাচার সহ্য করিয়াও প্রকাশ্যভাবে স্বয়ং রাজভার গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু তদীয় কর্তৃত্বাধীনে একটি নগণ্য

ইংরাজের সহিত যুদ্ধ-বাসনায় কৈতিমাবিতে মণিপুরী সৈন্য দুর্গরচনা করিয়া এতাবৎ রক্ষা করিতেছিল। অদ্য প্রাতেও তাহারা দুর্গ সংরক্ষণে তৎপর ছিল। কিন্তু প্রবলপ্রতাপ ইংরাজ-সৈন্যের অভ্যুদয়-বার্ত্তা অবগত হইবামাত্র তাহাদিগের আর সাহস কুলাইল না, প্রাণভয়ে মণিপুরাভিমুখে সকলে পলায়ন করিল। কৈতিমাবি শিবিরে কিয়ৎকাল অবস্থানের পরেই পরবর্ত্তী সেঙ্‌মাই গ্রামস্থ অধিবাসীগণের লিখিত এক পত্র পাওয়া গেল; তাহাতে প্রকাশ যে,—মণিপুরাধীশ্বর ইংরাজ-রাজের সহিত সখ্য স্থাপনোদ্দেশে যুদ্ধ করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন, সে কারণ তৎপ্রদেশস্থ সৈন্যগণ আর যুদ্ধ করিবে না, বরং ইংরাজ-সেনা সেঙ্‌মাই পৌছিলে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া তাহারা যথাসাধ্য আনুকূল্য সাধন করিবে। কোহিমার ডেপুটী কমিশনার শ্রীযুক্ত ডেভিস্ সাহেব রাজনৈতিক কর্ম্মচারী (Political Officer) রূপে আমাদিগের সহযাত্রী ছিলেন; প্রধান সেনাপতি এবং তদানীন্তন লাট, Sir Henry Collett, বাহাদুর কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি উক্ত পত্রের উত্তরে জ্ঞাপন করিলেন যে, সেঙ্‌মাই গ্রামের কোন প্রজার ইংরাজহস্তে

শিশুর রাজত্বকে আর কোন্ প্রাণে স্বাধীন রাজ্য বলিব?—পরাধীনতার ইহাপেক্ষা সজীব মূর্ত্তি আমাদিগের নয়নবৃত্তিতে প্রতিভাত হয় না।

কোন আশঙ্কা নাই, তাহাদিগের বিষয়সম্পত্তির কোনরূপ অপব্যবহার হইবে না, এবং তাহাদিগের দেয় দ্রব্যাদি সাদরে গৃহীত হইবে। অনাগত বিপদের উগ্রমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পূর্ব্বে যেরূপ আশঙ্কিত হইয়াছিলাম, বিপদক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া বিপদভয়হারী মধুসূদনের কৃপায় সে আশঙ্কা অনেকটা তিরোহিত হইল, আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে সে রাত্রি শিবির মধ্যে অবস্থান করিলাম।

২৬ এ এপ্রিল, রবিবার, প্রত্যূষে ৬ ঘটিকার সময়, আমরা কৈতিমাবি পরিত্যাগ করিয়া সেঙ্মাই অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। বিপদাশঙ্কা অনেক পরিমাণে মন হইতে উন্মূলিত হইলেও, যতই মণিপুরের নিকটস্থ হইতে লাগিলাম, ততই রণরঙ্গের প্রকট ছায়া অলক্ষ্যে অন্তরাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতে লাগিল। প্রখর নৈদাঘ তপন মস্তকে করিয়া ঠিক মধ্যাহ্ন কালে আমরা সেঙ্মাই পৌঁছিলাম; সৌভাগ্যের বিষয়, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের খরতর তাপ ভিন্ন অপর কোন জ্বালা-যন্ত্রণা সেখানে পৌঁছিয়া সহ্য করিতে হইল না। পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রানুযায়ী তত্রত্য অধিবাসীবর্গ প্রকৃত প্রস্তাবেই শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল, বৈরিতার কোন লক্ষণই তথায় লক্ষিত হইল না। না হইলেও, ইংরাজরাজের মন হইতে আশঙ্কা একেবারে উন্মূলিত হয় নাই; হইবার কথাও নহে,—যাহারা নৃশংস ভাবে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গকে বধ করিতে পারে, প্রকাশ্যে শান্তমূর্ত্তি দেখাইয়া প্রচ্ছন্নভাবে প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হওয়া

তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত বিচিত্র নহে। সুতরাং এইস্থান হইতেই মণিপুর প্রবেশের পূর্ব্বায়োজন মীমাংসিত হইল। কোহিমা, কাছাড় ও তম্মু—তিন পথ দিয়া তিনদল সেনা একসঙ্গে মণিপুরে প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা ছিল; সেই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত কাছাড়-সৈন্যের অধিনায়ক কর্ণেল রেণিক এবং তম্মু-সৈন্যের অধিনায়ক জেনারেল গ্রেহা-মকে আমাদিগের গতিবিধি জ্ঞাপন করিয়া এইস্থান হইতে পত্র লিখিত হইল। দিবাভাগে অপর কোন কার্য্য করিতে হইল না।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগতা। আজ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, সন্ধ্যাগমেই চন্দ্রজ্যোতি দৃষ্টিগোচর হইল না, বরং সান্ধ্য গগনে কিঞ্চিৎ মেঘের সঞ্চার হওয়াতে প্রকৃতি অধিকতর অন্ধকারময় হইয়া উঠিল, অল্প অল্প বৃষ্টিপাতও হইল, প্রাণটাও কেমন একবার উদাস হইয়া পড়িল। তবে সে কষ্ট অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না,—মেঘ কাটিল, চাঁদ উঠিল, মনের ময়লাও ঘুচিল। আহা-রান্তে নিদ্রাও গেলাম। রাত্রি আনুমানিক দ্বিপ্রহরের পর নিদ্রাভঙ্গ হইল, একটু কাণাকাণি শুনিলাম, হঠাৎ প্রাণটা শিহরিয়া উঠিল; ভাবিলাম, আবার কোন্ বিপদ সমুপস্থিত, হয় ত মণিপুরী সৈন্য অলক্ষ্যে আমাদিগকে আক্র-মণ করিতে আসিয়াছে। কিন্তু, সৌভাগ্যের বিষয়, সে আশঙ্কা অধিকক্ষণ অন্তরে পোষণ করিতে হইল না; অচিরেই জানিতে পারিলাম,—মণিপুর হইতে, ক্রমান্বয়ে, দুইখণ্ড পত্র

আসিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে,—'টীকেন্দ্রজিৎ ত্রিপথগামিনী বৃটিশ-বাহিনীর রণবাদ্য দূর হইতে শুনিয়াই অরণ্য-পথে পলায়ন করিয়াছেন।' ভাবিলাম, কাপুরুষের কার্য্যই এইরূপ—

"নষ্টস্য কান্যা গতিঃ ?"

৯।—মণিপুর।

আজ ২৭ এ এপ্রিল, ১৫ ই বৈশাখ, সোমবার—মণিপুর-প্রবেশের দিন ;—দুর্দ্দান্ত মণিপুরীর হস্তে ইংরাজ-রাজপ্রতিনিধিবর্গের প্রাণনিধনের পর মণিপুর-রাজ্যকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য এতদিন যে আয়োজন হইতেছিল, আজ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার দিন ;—গোপনে, গৃহের কোণে, আশ্রিতের প্রতি মণিপুরী যে দারুণ অকার্য্য-সাধন করিয়াছিল, আজ প্রবলপ্রতাপ ইংরাজ-রাজের হস্তে প্রকাশ্যভাবে তাহার প্রতিবিধানের সময় সমুপস্থিত। রবিবারের রাত্রি কোনক্রমে অবসান হইল, নৈশ অন্ধকার কোনরূপে অপসৃত হইল, কাক-পক্ষী কোন দিকে দুই দশটা ডাকিয়া উঠিল—আমরা সকলে সেঙ্‌মাই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলাম ; আর কোনক্রমে বিলম্ব নহে,—বালসূর্য্যের স্নিগ্ধ রশ্মি উঠিতে না উঠিতে, সকলের প্রাতঃক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে না

হইতে, ছয়টা বাজিতে না বাজিতে, আমরা মণিপুরের পথে অগ্রসর হইলাম। মন এখনও সন্দেহদোলায় দোদুল্যমান—

"হয়, কি না হয়, কতই হয় উদয়!"

মণিপুরীর অসাধ্য কিছুই নাই, প্রকাশ্যভাবে প্রাণ-ভয়ে দেখা দিল না, শেষে রাজ্য মধ্যে পুরিয়া, কি জানি, গোপনে প্রাণবধ করিবে—এই চিন্তা পথের মধ্যেও মনে কখন কখন উদিত হইতে লাগিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, নৈদাঘ সূর্য্যাতাপ ভোগ করিতে করিতে, বেলা ১১ ঘটিকার সময়, আমরা মণিপুর পৌঁছিলাম। চিন্তিত বিপদের কোন চিহ্নই দেখিলাম না; দেখিলাম সহর—

"নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপং!"

পথে জনমানব নাই, মণিপুরীর মূর্ত্তি একটীও নয়নপথে পতিত হয় না, চতুর্দ্দিক ভস্মস্তূপে আচ্ছন্ন—যেন নির্জ্জন শ্মশানে কে অনতিপূর্ব্বে রাশি রাশি প্রেতকার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছে! রাজা, যুবরাজ, পারিষদবর্গ, আপামর সাধারণ, সকলেই পলাইয়া গিয়াছে—কেহ বনে-জঙ্গলে, কেহ কেবল লোকলোচনের অতীত অন্তরাল-প্রদেশে। কেন এমন হইল, কে এরূপ করিল, কিছুই তখন বুঝিতে পারিলাম না; ভাবিলাম—স্বকৃত দুষ্কৃতের ইহাই সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত।

পূর্ব্বের আয়োজনমত তিন পথ হইতে তিন দল সেনাই সমাগত হইল। কাছাড় সৈন্যই সর্ব্বপ্রথমে মণিপুর প্রবেশ

করে; আমাদিগের ন্যায় কাছাড়ের পথেও ইংরাজ-সৈন্যকে মণিপুরীর হস্তে কোনরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই—ক্বচিৎ কোথাও দুই-দশটা মণিপুরী মাথা তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু সুশিক্ষিত বৃটিশ-সৈন্যের ফুৎকারমাত্রে তাহারা পরাভূত হইয়াছিল। তম্মুর পথেই ইংরাজ-সৈন্যকে কিঞ্চিৎ বেগ পাইতে হইয়াছিল,মণিপুরীর হস্তে অনেককে সম্মুখ-সমরে প্রাণ দিতেও হইয়াছিল; সে যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত পাঠকবর্গ পূর্ব্ব হইতেই সম্যক্ বিদিত আছেন, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তিন দিকের তিন দল সমবেত হইল, দারুণ মধ্যাহ্ন-সময়ে রবিকর-প্রপীড়িতাবস্থায় সকলে কেন্দ্রীভূত হইল, সমগ্র সৈন্যের অধিপতি হইলেন—আমাদিগেরই কর্ত্তা, কর্ণেল বাহাদুর; এই সমবেত সৈন্যদলের নাম হইল—

"Manipur Field Force."

তিন দলের দলপতির মধ্যে কর্ণেল বাহাদুর সর্ব্বোচ্চ বলিয়া তাঁহারই হস্তে কর্তৃত্ব-ভার সমর্পিত হইল, এবং এই কর্তৃত্বকালে তিনি Major General পদে অভিষিক্ত হইলেন। এই সৈন্য-সমাগম ও অভিষেক-কার্য্য বড়ই নয়নানন্দবর্দ্ধক—উৎসাহ-উচ্ছ্বাসে মনও কি এক অত্যদ্ভুত বীররসে বিভোর হইয়া গেল; ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া, পথ-শ্রান্তি উপেক্ষা করিয়া, নিদারুণ সূর্য্যতাপও অনায়াসে সহ্য করিয়া সেই সমারোহ কাণ্ড সন্দর্শন করিতে লাগিলাম।

এই সমস্ত ব্যাপার শেষ হওয়ার পর যখন স্নানাহ্নিকে মতি হইল, তখন বেলা তৃতীয় প্রহর। যাহা হউক, নির্দ্দিষ্ট বাসমণ্ডপে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া,—বিশ্রামের অন্য উপকরণ নাই—বঙ্কিমবাবুর প্রশংসিত দুশ্চিন্তাহারিণী সজল হুঁক্কা-বিহারিণী তাম্রকূট দেবীও নাই—মহাত্মা DeQuinceyর মর্ম্মপীড়া-বিনাশক, নিস্তেজ শরীরেও ক্ষণিক উৎসাহ-বর্দ্ধক, অহিফেন-রসও নাই—ভক্তপ্রধান রামপ্রসাদের কালীনামাত্মক ভক্তি-প্রণোদক সুধারসও নাই—সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যবশে বলিতে পারি না, বিধাতা ঐ দেবতাবাঞ্ছিত মহামহোপাধ্যায়-প্রশংসিত তিন রসের কোন রসই অধমকে উপভোগ করিতে দেন নাই—কেবল উপাধানে মস্তক রাখিয়া, চৌদ্দ-পোয়া হইয়া চারিদণ্ড বিশ্রাম করিয়া,—স্নানোদ্দেশে বহির্গত হইলাম। স্নানান্তে যখন গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করি, পথিমধ্যে—দরবার-হলের দ্বারদেশে—হরিদাস বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পাঠকবর্গ, বোধ হয়, হরিদাস বাবুর পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই পরিজ্ঞাত আছেন—ইনি স্বর্গীয় চীফ কমিশনর কুইণ্টন বাহাদুরের সহযাত্রী কেরাণী, বিগত লোমহর্ষণ কাণ্ডের পর মণিপুর-দরবারে বন্দী। চারি চক্ষুর মিলন হইবামাত্র উভয়ে অবাক্! যে অবধি মণিপুরের হত্যাকাণ্ড রাজধানী শিলং-শৈলে সরকারী মহলের শ্রবণগোচর হইয়াছিল, হরিদাসের জীবন সম্বন্ধে সেই অবধি সকলেই সন্দিহান;—এই হত্যাকাণ্ডের পর যাহারা প্রাণে বাঁচিয়া-

ছিল, একে একে সকলেই শিলং পৌঁছিল—এমন কি হরিদাস বাবুর নিজ ভৃত্য ও পাচকাদি বিবি গ্রিমউডের সহিত পলায়নপর হইয়া নিরাপদে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল—কিন্তু হরিদাসের কোন সংবাদ নাই! ভৃত্যেরাও কোনও সংবাদ জানে না—বিপদের সময় তাহারা আপন প্রাণ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত; অন্নদাতা প্রভুর কোন সম্বাদই রাখে নাই! হরিদাস বাবুর বৃদ্ধা জননী, প্রাণসমা প্রণয়িনী, সুবোধ শিশুগুলি, একপ্রাণ সহোদরগণ, সোদরাভিমানী সুহৃদ্বর্গ, পরিচিত পথের লোক পর্য্যন্ত—সকলেই তাঁহার জীবন সম্বন্ধে নিরাশ; বাঁচিলে এতদিন ফিরিত, পলাইতে পারিলে কোন না কোন উপায়ে সংবাদ পাঠাইত,—পথে-ঘাটে এইরূপ বিবাদ-বিতর্ক, চতুর্দ্দিকে তারের সংবাদের ছড়াছড়ি, আর সংবাদাভাবে সন্দেহের ক্রমশঃ বাড়াবাড়ী! রাজ-সরকারের সেক্রেটারি সাহেব পর্য্যন্ত সন্দিগ্ধ ও বিষাদিত—'অন্যে পরে কা কথা?' হরিদাস বাবু ইতিপূর্ব্বেই বঙ্গের ছোটলাট Sir Charles Elliot বাহাদুরের খাস দরবারে দাওয়ানি পাইবার আশা পাইয়াছিলেন—ভগবানের কৃপায় সে পদে তিনি উপস্থিত যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিতেছেন—কেবল কুইণ্টন বাহাদুরের বিশেষ অনুরোধে, তিনি এযাত্রা আসাম-রাজ্যে এই শেষ রাজ-সহচর হইয়া মণিপুর গিয়াছিলেন; সুতরাং—

"যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি
যচ্চেতসা ন তদিহাভ্যুপৈতি।
প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তী
সোঽহং ব্রজামি বিপিনে জটিলস্তপস্বী॥"—

এইরূপ কত চিন্তাই তখন হরিদাস বাবুর মনে উদয় হইয়াছিল, আর শিলঙেও সকল প্রাণী ঐ ভাবিয়া 'হা হতোস্মি!' করিয়াছিল। জননী ও গৃহিণী কখনও নৈরাশ্যের উচ্ছ্বাসে আত্মবিস্মৃত হইয়া বিহ্বলচিত্তে চীৎকার করিয়া রোদন করিয়াছেন, আবার কখনও বা 'অকল্যাণ হইবে' ভাবিয়া আশায় বুক বাঁধিয়াছেন। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমরা শিলং পরিত্যাগ করি। পরিদৃশ্যমান ঘটনাচক্রে হরিদাসের জীবনসম্বন্ধে আমাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র আশা ছিল না; যতদিন শিলঙে সংবাদ পরিচালনা করিতে পারিয়াছিলাম, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই; আর যে অবধি সংবাদ বন্ধ, সে অবধি নিজের প্রাণাশঙ্কাতেই প্রতিক্ষণ বিকলচিত্ত; সুতরাং হরিদাস বাবুর চিন্তা মনোমধ্যে স্থান পায় নাই। আজ অকস্মাৎ হরিদাস বাবুর সাক্ষাৎলাভে প্রাণের ভিতর যে কি হর্ষ সঞ্চারিত হইল, তাহা বর্ণনার বিষয়ীভূত নহে, অনুভূতির পদার্থ।

হরিদাস বাবুর সহিত এ সাক্ষাতে প্রাণের সকল কথার বিনিময় ঘটিল না। সংক্ষেপে স্বাগত প্রশ্নাদি সমাপন করিয়া

ও উভয়ের অবস্থা পরস্পর কতকটা উপলব্ধি করিয়া আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম। বহুদিন বিচ্ছেদের পর প্রিয়সমাগম পরম সুখপ্রদ সামগ্রী হইলেও, আমরা এ সুখ অধিকক্ষণ উপভোগ করিতে পারিলাম না—উভয়ে একত্র বাস করিয়া পরস্পর আনন্দবর্দ্ধন করিব, সে সুযোগও ঘটিল না। আমাদিগের উভয়ের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন—এক জন রাজকার্য্যের অনুরোধে প্রভুর আদেশাধীন, অপর বিদায়োন্মুখ অনুমতি-সাপেক্ষ, প্রকারান্তরে বন্দী—সুতরাং উভয়ের একত্র অবস্থান অসম্ভব। অনিচ্ছায় বিদায় গ্রহণ করিয়া আমি স্বীয় বাস-মণ্ডপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, এবং তৎকালোচিত আহার্য্যে কথঞ্চিৎ ক্ষুধাশান্তি করিয়া সেদিনের দফা শেষ করিলাম।

১০।—অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।

২৮এ এপ্রিল, মঙ্গলবার।—এখন আর অপর কার্য্য নাই। পলায়িত রাজকুলের অনুসন্ধানে বিশ্বস্ত চর সকল রাজ্যের চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইল। যে, যে দিকে যায়, গোলা-গুলি, বারুদ-বন্দুক, অস্ত্র-শস্ত্র—সকলেরই নয়ন-গোচর হয়; পলায়নপর পথিকের অসাবধানতা বশতঃ প্রক্ষিপ্ত পাথেয়-সম্বল সকলেই দেখিতে পায়; কিন্তু মূল পাপীর অনুসন্ধান

কেহই প্রাপ্ত হয় না। প্রক্ষিপ্ত পদার্থের অনুসরণ করিয়া, শেষে সকলেই হতাশ হৃদয়ে ঐ সমস্ত দ্রব্য লইয়া প্রত্যাগমন করে, এবং তদ্দ্বারা নিজ কর্ত্তব্য পরিচালনের সম্যক্ পরিচয় দিয়া সে দিনের দায় হইতে নিষ্কৃতি পায়। এইরূপে তিন দিন পর্য্যবসিত হইল। ৩০ এ এপ্রিল প্রাতে লেফ্‌টানণ্ট দেওয়ার সাহেব সংবাদ আনিলেন, যতই অগ্রসর হওয়া যায়, সেনাপতি (তদানীন্তন যুবরাজ) তিন দিনের পথ অগ্রে থাকেন, এবং সেই পার্ব্বতপথে প্রত্যহ দশ ক্রোশ করিয়া পদব্রজে পরিভ্রমণ করেন। তিনি পথিমধ্যে বিস্তর বন্দুক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে, একটি বড়লাট সাহেব কর্ত্তৃক পূর্ব্বতন মহারাজকে উপহৃত হইয়াছিল। তিনি পথে, রাজদরবার-ভুক্ত বিস্তর হস্তীকে অবাধে বিচরণ করিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন; কিন্তু আয়ত্ত করিতে অশক্ত হওয়ায় তাহা সমভিব্যাহারে আনিতে পারেন নাই; যাহা হউক, তাঁহার এই সংবাদ-প্রদানের অনতিবিলম্বেই রাজদরবারের প্রধান মাহুত একদলে ২৬টি হস্তী ইংরাজ-রাজের সমক্ষে আনয়ন করিল। তখন মনে মনে ভাবিলাম, পশুরূপী হস্তী যখন ধরা পড়িয়াছে, তখন মনুষ্যরূপী রাজহস্তী ধরা পড়িতে আর বড় বেশী বিলম্ব নাই। দেওয়ার সাহেব, হস্তী আনয়নে অসমর্থ হইলেও, অশ্ব আনয়নে পশ্চাৎপদ হয়েন নাই; তাঁহার পরিশ্রমের ফল-স্বরূপ উল্লিখিত বন্দুক ভিন্ন তিনি আটটি সুন্দর অশ্ব আনিয়াছিলেন। যুবরাজ ভিন্ন

অপর ভ্রাতারা প্রাসাদাভিমুখে পলায়ন করিয়াছে বলিয়া তিনি স্থির করেন, এবং যুবরাজের প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধান-মানসে এক জন নাগাজাতীয় গুপ্তচর পাঠাইয়া দেন। বলা বাহুল্য, অপর দুই দিনের কার্য্য অপেক্ষা দেওয়ার সাহেবের এই সমস্ত কার্য্য ও সংবাদ অনেকাংশে মূল্যবান।

আজি আর এক মহাসমারোহ। ইংরাজসৈন্য, মণিপুর-প্রবেশের পরেই, পরলোকগত ইংরাজ-রাজপুরুষগণের মৃতদেহ অনুসন্ধান করেন, এবং বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় তাঁহাদিগের কঙ্কালাবশেষ প্রাপ্ত হয়েন। আজ তাহারই সমাধির দিন। ২৮এ এপ্রেল তারিখেই ইহার কার্য্য-প্রণালী সূচিত হয়, তদুপলক্ষে 'মেজর জেনারেল কলেট' বাহাদুরের আদেশ-বার্ত্তা কর্ম্মচারীবর্গের মধ্যে বিঘোষিত হয়। আজি প্রাতেই সেই ঘোষণানুযায়ী কার্য্যকলাপ আরম্ভ হইল। দরবার-প্রাঙ্গণের উত্তরে বর্ত্তমান 'পলিটিক্যাল এজেণ্ট মেজর ম্যাক্স-ওয়েল' সাহেবের আপিস। এই বাটী পূর্ব্বে 'পাখাংবার বাটী'* বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ইহারই মধ্যে রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। পৈতৃক সিংহাসন বলিয়া, প্রত্যেক মণিপুরী নৃপতি, রাজ্যাভিষেক-কালে, এই সিংহাসনোপরি অধিরোহণ করিতেন। যাহাই হউক, উল্লিখিত পাখাংবার বাটীর সম্মুখে

* শুনিয়াছি, "পাখাংবা" শব্দ মণিপুরী ভাষায় আদিপুরুষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পাঠকগণের সুপরিচিত ইষ্টক-নির্ম্মিত যুগলসিংহ-মূর্ত্তি (Dragons) বিদ্যমান ছিল। জনশ্রুতি,ইহারই সমক্ষে গ্রিম্‌উড্‌ ভিন্ন অন্যান্য সাহেবের সংহার-কার্য্য সাধিত হইয়াছিল। এই কারণেই হউক, বা অপর কোন উদ্দেশ্যেই হউক, সমাধি-যাত্রার পূর্ব্বেই,তাহার মধ্যে একটি সিংহমূর্ত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণিত হইল।

পূর্ব্বতন দরবার-প্রাঙ্গণে অধুনাতন সরকারী আপিস সমূহ স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী বিস্তৃত ভূক্ষেত্রে সমাধি-সমারোহের অনুযাত্রিবর্গ প্রত্যূষে সমবেত হইলেন, এবং ঠিক সাত ঘটিকার সময় শোকোপহত চিত্তে সকলে সমাধি-ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ দ্বারদেশ হইতে রেসিডেন্সী-ভবন-সংলগ্ন প্রহরী-অবস্থানের সম্মুখ পর্য্যন্ত, রাজপথ সমূহের উভয় পার্শ্বে ৪৩ নম্বর গূর্খা পল্টনের অধিনায়ক কর্ণেল ইভান্‌স্‌ সাহেবের তত্ত্বাধীনে, ৪২, ৪৩ এবং ৪৪ সংখ্যক গূর্খা পল্টনের সৈন্যসমূহ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। সেই সমাধি-যাত্রার সমারোহ-দর্শনে হৃদয়ে শোক-বিস্ময়-জড়িত কি এক অব্যক্ত ভাবের উদয় হইল;—অসংখ্য লোকজন পরিবৃত, রঙ্‌ তামাসা-রোস্‌নাই-রেশালা-সংবৃত, বিচিত্র কারুকার্য্যময় সুন্দর সাজে সজ্জিত, বরের বিবাহোদ্দেশে শুভযাত্রা দেখিয়াছি; আবার হরিসঙ্কীর্ত্তনে দিঙ্মণ্ডল মাতাইয়া অবিরাম তারক-ব্রহ্মনাম জপ করিয়া পুণ্যশ্লোক পিতামহের প্রেতদেহ বহন করিয়া নগ্নপদে ভগ্নমনে ভাগীরথী-সৈকতাভিমুখে

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সাধনোদ্দেশেও যাত্রা করিয়াছি; কিন্তু ঐরূপ কোন যাত্রাই আজিকার এই সমাধি-যাত্রার সমকক্ষ নহে। একের স্ফূর্ত্তির উচ্ছ্বাস, অন্যের অবসাদময় দীর্ঘশ্বাস, আজি একক্ষেত্রে সমসূত্রে জড়িত; ইংরাজের সকল কার্য্যেই এইরূপ সুগম্ভীর সুশৃঙ্খলতার সমাবেশ—দেখিলে, হৃদয় বিস্ময়বিমিশ্র পুলকরসে পরিপ্লুত হয়। যাহা হউক, আজিকার এই সমারোহের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাউক। এই মণিপুর-বিপ্লবোপলক্ষে বর্ম্মা হইতে তম্মুর পথে 'King's Royal Rifles' নামক গোরা-পল্টন আসিয়াছিল; তাহারই একদল সর্ব্বাগ্রে তোপ-সরঞ্জাম-সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইল। তৎপশ্চাতে তাহাদিগেরই অন্য একদল দিগন্তনিনাদী শোক-সঙ্গীত সঘনে বাজাইয়া চলিল; কিবা কোমল-কঠোর ভাব! অগ্রে গগনভেদী বজ্রনির্ঘোষবৎ তোপ-ধ্বনি, পশ্চাতে প্রাণ-মন-ব্যাকুলকর অদ্ভুত শোক-সঙ্গীত—এই পরস্পর-বিরোধী ভাবের সংমিশ্রণ কি সুন্দর রসের অবতারক, তাহা সাহেবকুলই বুঝিতে পারেন। বাদক-গণের পশ্চাতেই স্বর্লোকগত সাহেবগণের শোকসংক্ষুব্ধ আত্মীয়বর্গ,—

১। সর্ব্বাগ্রে, উল্লিখিত ইংরাজ সৈন্যদলের দলপতি 'মেজর জি, জি, গ্রিম্‌উড্‌'। ইনি মৃত গ্রিম্‌উড্‌ সাহেবের সহোদর।

২। পরে, ক্রমান্বয়ে, 'মেজর্‌-জেনারেল্‌ এচ্‌, কলেট' বাহাদুর এবং তাঁহার পার্শ্বচর পারিষদবর্গ। ইনি মণিপুরে সমাগত

ইংরাজকুলের কর্ত্তা, এবং তদানীন্তন আসাম-রাজ্যের অধিপতি—স্বয়ং 'চীফ্‌-কমিশনর।'

৩। তৎপরে, 'ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল টি, গ্রেহাম' এবং তাঁহার পারিষদগণ। ইনি ব্রহ্মসেনানীর নায়ক এবং কর্ণেল বাহাদুরের প্রায় সমকক্ষ; কেবল পদের অভিনবত্ব প্রযুক্ত তাঁহার এক সোপান নিম্নে।

৪। তৎপশ্চাতেই 'মেজর ম্যাক্সওয়েল্‌'। ইনি কার্য্য-দক্ষতাপ্রযুক্ত রাজসরকারে সম্মানিত, সম্প্রতি 'সি, এস, আই'-উপাধিপ্রাপ্ত, এবং বর্ত্তমান মণিপুর-সাম্রাজ্য-পরিচালনের সর্ব্বময় কর্ত্তা।

৫। তৎপশ্চাতে, ক্রমান্বয়ে, ৪২, ৪৩ ও ৪৪ সংখ্যক গূর্খা সৈন্যের সাহেবগণ।

এই সমস্ত খ্যাতনামা সাহেবদিগের পশ্চাতে পল্টন-সমূহের নিম্নপদস্থ সাহেবগণ, চারিজন করিয়া,শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিলেন, এবং পল্টনের সিপাহিবর্গ তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইলেন। সিপাহির সংখ্যা অসংখ্য; সকলে সঙ্গী হইলে রাস্তায় স্থান-সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব, সরকারী অন্যান্য কার্য্যের পক্ষেও অন্তরায়; এ কারণ আদেশ থাকে—প্রত্যেক দলের একশত জন সম্মিলিত হইয়া এক এক ক্ষুদ্র দল গঠিত হইবে, এবং তাহারাই সমগ্র দলের প্রতিনিধি-স্বরূপ এই সমাধি-যাত্রার অনুযাত্রী হইবে। তদনুসারে নিম্নলিখিত প্রত্যেক সৈন্যদল হইতে শতেক সিপাহি দলবদ্ধ হইয়া, চতুর্থ সংখ্যক গূর্খাদলের

অধ্যক্ষ 'মেজর স্যার্ সি, এচ্, লেস্‌লি, বার্ট' বাহাদুরের কর্তৃত্বাধীনে যাত্রা করিয়াছিল:—

৮ সংখ্যক পার্ব্বতীয় তোপ-পরিচালকদলের ভগ্নাংশ।

২ সংখ্যক গূর্খা দলের প্রথম পল্টন।

৪ সংখ্যক গূর্খা দলের দ্বিতীয় পল্টন।

৪২, ৪৩ এবং ৪৪ সংখ্যক গূর্খা পল্টন।

সমাধি-ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রাকালে প্রাসাদের পশ্চিম-দ্বারের বহির্ভাগস্থ ভূ-চত্বর হইতে ২ সংখ্যক পার্ব্বতীয় তোপ-পরিচালক গোরাপল্টন কর্ত্তৃক প্রতি মুহূর্ত্তে তোপধ্বনি হইতে লাগিল, এবং সমাধি-কার্য্য সমাপনান্তে কবরের উপরিভাগে পূর্ব্বকথিত 'কিংস্ রয়াল্ রাইফল্‌স্' নামক সৈন্যদল কর্ত্তৃক বজ্রনির্ঘোষে তিন বার তোপোদ্গারিত হইল। বলা বাহুল্য, মণিপুর-রাজ্য মধ্যে যে কয়েকজন সাহেব হত হইয়াছিলেন, এস্থলে তাঁহাদিগেরই সমাধি হইল; তার-বিভাগের কর্ত্তা মেলভিল্ বাহাদুর পথিমধ্যে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, লোক-লোচনের অজ্ঞাতে সেই নিভৃত প্রান্তর-প্রদেশেই অযত্ন-প্রক্ষিপ্ত-ভাবে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি সংসাধিত হইয়াছিল। কিন্তু ফল একই—রাজ্যমধ্যে সমারোহ-সহকারে বন্ধু-বান্ধব স্বজন কর্ত্তৃক এই সমাধিতে, এবং সেই বিজন শ্মশানে শৃগাল-কুক্কুরের কবলান্তর্গত হওয়াতে প্রেতাত্মার অবস্থা একই; মুসলমান কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

"চবর্ তখ্‌ত মূর্দ্দন্, চবর্ রূ'য়ে খাক্!"

তবে মনুষ্য যতদিন ইহজগতে জীবিত থাকে, স্মৃতির কুহকে আত্মহারা হইয়া বাহ্য শোভায় মৃতেরও সৎকার করিতে ব্যাকুল হয়। যাহা হউক, পদ-মর্য্যাদানুসারে—

চীফ্ কমিশনার কুইণ্টন বাহাদুর,
৪২ নং গূর্খা সৈন্যের অধিনায়ক কর্ণেল স্কীন,
পলিটিক্যাল এজেণ্ট গ্রিমউড্ সাহেব,
চীফের পার্শ্বচর কসিন্স্ সাহেব,
৪৩ নং গূর্খাদলের লেফ্ঃ সিম্সন্,
৪৪ নং গূর্খাদলের লেফ্ঃ ব্রাকেনবেরি,—

এই ছয় জনের কঙ্কাল, ক্রমান্বয়ে, কবর-মধ্যে প্রোথিত হইল। যুদ্ধযাত্রায় পারলৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতা পুরোহিত বা আচার্য্যের প্রয়োজন হয় না। এই সমাধি-সূত্রেও সুতরাং সাহেবাচার্য্য পাদরি-পুঙ্গবের অসদ্ভাব ছিল। দলপতি বলিয়া মেজর-জেনেরল কলেট বাহাদুরই অগত্যা প্রেত-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন; মৃত মহাত্মাগণের পারলৌকিক মঙ্গল-কামনায় তৎকর্ত্তৃক ভগবন্নামানুকীর্ত্তনাদি সংসাধিত হইল।

দিবাভাগে এই সকল সমারোহ-ব্যাপার সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হইয়া গেল। রাত্রিতে প্রকৃতির ভীষণভাব—মুষলধারে বৃষ্টি, বিকট বজ্রপাত, দিগন্ত ব্যাপিয়া বিজলির খেলা। সহসা প্রকৃতির এই ভাবান্তর দেখিয়া, মনে যুগপৎ হর্ষ-বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। ভাবিলাম, প্রবলপ্রতাপ ইংরাজরাজের নিকট প্রকৃতিও পরাহতা—ইংরাজের কার্য্যকুশলতা বুদ্ধির

জন্য প্রকৃতিও তাঁহার অনুগতা। দিবাভাগে এইরূপ দুর্যোগ ঘটিলে, সমাধি-সরঞ্জাম বিলক্ষণ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িত; তাই তখন প্রকৃতির সাম্যভাব! আর দুর্দ্ধর্ষ মণিপুরীর অন্তরাত্মা ব্যথিত করিবার নিমিত্ত এই ঘোর নিশীথে প্রকৃতির বিষম বিকৃতাবস্থা! যাহা হউক, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ —স্বভাবের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। দারুণ দুর্যোগময় রাত্রি প্রভাত হইল—আবার প্রকতি নিস্তব্ধ, জগতে আর সে ভাব নাই, সকলই শান্ত, সুন্দর, সমুজ্জ্বল। আজ আর উল্লেখ-যোগ্য অন্য কোন ঘটনা ঘটিল না, কেবল পূর্ব্বদিনের অব-শিষ্ট স্মৃতিকষ্টদায়ক সিংহমূর্ত্তি সমূলে উৎপাটিত হইল। বোধ করি, ইহাতেই ইংরাজের গাত্রজ্বালা অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইল।

২রা হইতে ৬ই মে নীরবে কাটিয়া গেল। উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ঘটনাই ঘটিল না; কেবল ৩রা তারিখে মিঞা মিঙ্গারো নামক মণিপুরী বন্দিভাবে আনীত হইল। পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল, এ ব্যক্তি পালেলের যুদ্ধে, ২৫এ এপ্রিল তারিখে, জেনারেল গ্রেহামের অধীনস্থ সৈন্যহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রকৃত ব্যাপারের সঙ্গে দূত-বার্ত্তার অনেক-স্থলেই এইরূপ পার্থক্য থাকিয়া যায়। যুবরাজ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সম্বাদ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও, শুনা গেল, অলীক। রাজ্যঘটিত কার্য্য কতক কমিল বটে; কিন্তু আমার কেরাণী-গিরীর কর্ত্তব্যের প্রসার বৃদ্ধি পাইল। সরকারি সংবাদ-পত্রি-

চালন-সূত্রে আমার কার্য্য অনেক পরিমাণে বাড়িল; দেশের অবস্থা দেখিব বা রাজকার্য্যের সূক্ষ্মানুসন্ধান করিব, সে সুযোগ বা অবসর রহিল না।

৭ই হইতে সিংহকুল—ছি! ছি! ঘৃণার কথা, নির্ব্বীর্য্য মেষকুল—ক্রমশঃ পাশবদ্ধ হইতে আরম্ভ হইল। প্রথমেই ধরা পড়িলেন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ টঙ্গাল জেনারেল; কলির ব্রাহ্মণের কি দারুণ অধোগতিই সমুপস্থিত! অশীতিবর্ষ বয়স্ক ব্রাহ্মণ কোথা সংসারের জঞ্জাল পরিহার করিয়া, লোক-লোচনের অন্তরালে বসিয়া, আপনা ভুলিয়া সচ্চিদানন্দে আত্মোৎসর্গ করিবে, না তাহারই কুমন্ত্রণায় কক্ষাশ্রিত অতিথির প্রাণ বিনষ্ট হইল। ব্রাহ্মণোচিত কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া যে নৃশংসতার বিভীষিকাময় কলুষমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে, ম্লেচ্ছ-হস্তে অপমৃত্যুই তাহার পক্ষে সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত। বিচারে সপ্রমাণ—ইংরাজ-বধের একমাত্র হেতু, এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ টঙ্গাল। পুরাকালে হিন্দু-নৃপতিকুলের রাজদরবারে সুমন্ত্রণা দিবার জন্য ব্রাহ্মণ সভাপণ্ডিত থাকিতেন। আর আজিকার হিন্দু-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পরামর্শ দেন, অতিথির বধসাধন করিতে। আজ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের প্রথম সূত্র সূচিত,—পিশাচ-স্বভাব বৃদ্ধ আজ দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ইংরাজকবলে কবলিত,—দুরন্ত ব্যাঘ্র, লৌহশৃঙ্খলে নিয়মিত। মানুষ ভ্রান্ত, অধিকতর ভ্রান্ত কাপুরুষ; নিজের কক্ষমধ্যে আবদ্ধ নিরাশ্রয় নিরস্ত্র পাঁচজনের প্রাণবিনাশকালে

কাপুরুষ ভাবে নাই, অচিরে পরাক্রান্ত প্রবল পুরুষের হস্তে তাহারও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই দুইদিন অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া, দুর্দ্দমনীয় ইংরাজ-রাজের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিবে ভাবিয়া, অধিকতর কাপুরুষতার পরিচয় দিল। যাহাহউক, ইংরাজের সুকৌশলে বৃদ্ধের সকল মন্ত্রণা ব্যর্থ হইয়া গেল,—আজ নির্ব্বীর্য্য মেষের ন্যায় সে সিংহকবলে আত্মোৎসর্গ করিল।

মন্ত্রীর পশ্চাতেই সাক্ষাৎ রাজা। ৮ই মে স্বয়ং মণিপুরাধিপ কুলচন্দ্র বৃদ্ধ মন্ত্রীর দশায় বন্দীভাবে ইংরাজসকাশে আনীত হইলেন। পর দিবস ঐ দশায় দেখা দিলেন, আয়া প্যারেল; ইনিও মণিপুর দরবারের অন্যতম সদস্য এবং সৈন্যদলের সম্ভ্রান্ত মেজর। এ বড় মন্দ দৃশ্য নহে; এতদিন সকলেই অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, এখন গড্ডলিকাপ্রবাহবৎ সকলে ক্রমে ক্রমে দেখা দিতে লাগিলেন। তবে আজ পর্য্যন্ত ইংরাজরাজের প্রধান লক্ষ্য টীকেন্দ্রজিৎ ধরা পড়িলেন না। কিন্তু হায়! ইংরাজের সূক্ষ্মানুসন্ধানে তুমি কত দিন এইরূপে বিবরাভ্যন্তরস্থ মূষিকবৎ আত্মগোপন করিয়া থাকিবে, আর তাহাতে তোমার জীবনের সুখই বা কি?

১৩ই মে সংবাদ পাওয়া গেল, পূর্ব্বতন মহারাজ কলিকাতা-প্রবাসী সুরচন্দ্র সিংহের দুইজন আত্মীয়—চৌবেদার এবং সেয়াবদ—অষ্টাদশজন অনুচর সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে মণিপুরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। উপস্থিত অবস্থায়

ইহাদিগের আগমনের অভিসন্ধি বুঝিতে না পারায়, মণিপুরের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা স্থির করিলেন, উহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া ইংরাজ-অধীনে অবরুদ্ধ রাখাই শ্রেয়ঃ। কাছাড়ের পথে বিষ্ণু-পুরের ছাউনিতে অবস্থিত কাপ্তেন গ্রিষ্টলীর হস্তে তদনুসারে সেই কার্য্যের ভার বিন্যস্ত হইল। কালক্রমে কিন্তু দেখা গেল, এ সংবাদ সমস্তই অলীক।

১৪ই হইতে ১৭ই নীরবে কাটিয়া গেল। দিন যায় দিন আসে,—প্রকৃতির ভাবান্তর নাই; নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য করি, আর প্রবাসজনিত অবসাদময় উদ্ভ্রান্তচিত্তে ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া ব্যাকুল হই। কত দিনে সকলে ধরা পড়িবে, কত দিনে বিচার-আচার ক্রিয়া-কলাপ পরিসমাপ্ত হইবে, কত দিনে আমাদিগের মণিপুর-প্রবাসের শেষ কাল সমুপস্থিত হইবে, এই চিন্তাতেই সতত বিভোর থাকি, আর মণিপুরের ভাগ্যচক্র পর্য্যালোচনা করিয়া কখন হাসি, কখন কাঁদি, কখন সকলই অসার বোধে প্রাণের উচ্ছ্বাসে 'হরি হরি' বলি!

১১।—শেষ কথা।

মণিপুরের বিপ্লব-ব্যাপার বিস্মৃতির অন্তরালে বিলুপ্ত হইতে চলিল,—রাজ্য মধ্যে সুখ, স্বস্তি, শান্তি, শোভা, পুনঃ সংস্থাপিত হইল,—শাসন-নীতির নূতন শৃঙ্খলা সুন্দর

ভাবে দেখা দিল,—আমার এই বিষাদ-কাহিনী কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ফুরাইল না। বিষাদের বিভীষিকাময়ী বৈচিত্র্য-বিহীন বিরহ-গাথা পাঠকবর্গেরও কিন্তু আর বড় রুচি-সম্মত বোধ হয় না,—অন্তিম ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণও তাঁহাদিগের নিকট এখন আর নূতন নহে; অতএব, এই স্থানেই এ কাহিনীর উপসংহার করা শ্রেয়ঃ। তবে,মণি-পুর-বিপ্লবের মেরুদণ্ড, যুবরাজ টীকেন্দ্রজিতের মৃত্যু-সংবাদ আমার এই দিনলিপি হইতে বিচ্ছিন্ন করা যুক্তিসিদ্ধ নহে; একারণ সেই ঘটনা পর্য্যন্ত দুই-চারি কথা লিখিব।

দিনের পর দিন যায়, আর বিপ্লবঘটিত এক এক মূর্ত্তি দর্শন দেন; দুই-এক দিন তাঁহাকে লইয়া বিচার-বিতর্ক চলে, পরে, হয় শমন-সদন, নয় দ্বীপান্তর-প্রেরণ, তাঁহার জন্য মীমাংসিত হয়। এইরূপ ঘটনার বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য দুই চারিটীর ধারাবাহিক তালিকা দেওয়া গেল,—

১৮ই মে। রাজার তৃতীয় সহোদর, অঙ্গসেনা, ধৃত ও বন্দীভাবে আনীত।

২০এ মে। গ্রিম্‌উড্‌ সাহেবের নিধনকর্ত্তা কজাও নামক পারিষদের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা।

২১এ মে। রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, জিলা গুণ্ডা, ধৃত।

২৩এ মে। স্বয়ং যুবরাজ ধৃত ও কারাবদ্ধ।

২৫এ মে। উল্লিখিত কজাওয়ের ফাঁশি।

৫ই জুন। মিঞা মিঞারোর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

৮ই জুন। সুবাদার নিরঞ্জন সিংহের প্রাণদণ্ড। যুবরাজের বিচারের পরিসমাপ্তি।

৯ই জুন। কুলচন্দ্রের বিচারারম্ভ।

১৩ই জুন। যুবরাজের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা।

১৬ই জুন। কুলচন্দ্রের বিচার-সমাপ্তি।

১৭ই জুন। উল্লিখিত জিলাগুণ্ডার বিচারারম্ভ।

১৯এ জুন। মেজার আয়া পারেল এবং কর্ণেল শামুসিংহের প্রতি দ্বীপান্তর-বাসের আজ্ঞা।

১৫ই জুলাই। উহাদিগের আণ্ডামান-নির্ব্বাসন।

১২ই আগষ্ট। যুবরাজ ও টঙ্গাল জেনারেলের প্রাণদণ্ড এবং কুলচন্দ্র ও সেনাপতির দ্বীপান্তর-নির্ব্বাসন সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক তারযোগে আজ্ঞা।

আর বিলম্ব সহিল না, স্বগৃহাশ্রিত অতিথির প্রাণ-বিনাশের সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের সময় উপস্থিত হইল। ১২ই আগষ্ট ভারত গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা মিলিল, ১৩ই প্রত্যূষেই ঐ দুই বীরকুলকলঙ্কের প্রাণদণ্ডবিধানের সময় নির্দ্ধারিত হইল। জীবদ্দশায় একে অন্যের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতেন,রাজকার্য্য পরিচালনায় উভয়ে একমতা-বলম্বী ছিলেন ;—আজ অন্তিমে একই মুহূর্ত্তে, একই প্রকরণে, একই অভিযোগে. একই স্থানে, উভয়ের প্রাণবায়ু নিঃশে-ষিত হইল। বিধাতার অবশ্যম্ভাবী বিধি কার্য্যে পরিণত হইল, বৃদ্ধ-যুবা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের দেহযষ্টি ফাঁশি-কাষ্ঠে ঝুলিতে

লাগিল—মণিপুররাজ্যের স্বাধীনতা-রঙ্গালয়ে চিরদিনের জন্য যবনিকা-পতন হইল! এই লোমহর্ষণ ব্যাপার অবলোকন করিতে ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র মণিপুরী বধ্যভূমিতে সমাগত হইয়াছিল। যুবরাজ ও টঙ্গাল—উভয়েই প্রজাসাধারণের বড় প্রিয় পাত্র ছিলেন; কি জানি, উভয়ের এক সময়ে প্রাণ-দণ্ড ঘটায় সমাগত দর্শকগণ উন্মত্ত হইয়া উঠে—এই আশঙ্কায় ইংরাজ-রাজাজ্ঞায়, সাত শত সিপাহী সশস্ত্র বধ্যভূমির চতুঃ-পার্শ্বে বীরদর্পে বক্ষঃস্ফীত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। দৃশ্য বড় মর্ম্মভেদী ও ভয়াবহ;—দর্শকবৃন্দ নির্বাক্, নিস্পন্দ, নিশ্চল! কেবল বৃদ্ধ টঙ্গাল এবং যুবরাজ টীকেন্দ্রজিতের পুত্র-কলত্র ও আত্মীয়-স্বজনের গগনভেদী রোদন ধ্বনিতে সেই বধ্যভূমির সুগম্ভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতে লাগিল। আর সেই তারস্বর ঘোর নিষ্ঠুরের হৃদয়েও প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিল।

মানুষ মরে,—যুবরাজ মরিল; পাপ করিয়াছিলেন,—প্রায়শ্চিত্ত ঘটিল; ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। তবে এক কারণে বড় ক্ষোভ থাকিয়া গেল। যুবরাজের তেজোবিক্রমের ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার অনেক কথা শুনিয়াছিলাম,* কার্য্যতঃ তাহার

* গ্রিমূউড্-গৃহিণী যুবরাজ টীকেন্দ্রজিতের পরলোকান্তেও বিলাতে বসিয়া তদীয় চরিত্রাদি সম্বন্ধে বিলক্ষণ প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন; নিম্নে তাহার একটু পরিচয় দেওয়া গেল—

The *Sena'pati* (afterwards যুবরাজ টীকেন্দ্রজিৎ) was our very good friend. There was something about him that

কোন পরিচয় পাইলাম না ; বরং অতিথির প্রাণবিনাশে ঘোর কাপুরুষতারই চিহ্ন দেখিলাম। ইংরাজসৈন্যের মণিপুর-প্রবেশ কালে যুবরাজের ক্ষিপ্রগতি পলায়ন সম্বন্ধে যে জনরব উঠিয়াছিল, কালক্রমে তাহাও অলীক দাঁড়াইল ; তিনি রাজ-ধানীর সন্নিকটেই গোপন ভাবে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা শুনিয়াছিলাম—ইংরাজ তাঁহার জীবিত দেহের দর্শন পাইবেন না ; এই সামান্য প্রতিজ্ঞাও পূর্ণ করিতে পারিলে তাঁহাকে ক্ষত্রিয় সন্তান ভাবিতে পারিতাম, কিন্তু, পরিতাপের বিষয়, অন্তিমে সেই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের মমতায় তিনি ইংরাজ-রাজের নিকট সামান্য বন্দীর ন্যায় প্রাণভিক্ষার নিমিত্ত দাঁড়া-ইলেন। ইহাপেক্ষা কাপুরুষতার লক্ষণ আর কি হইতে পারে ?

---

is not generally found in the character of a native. He was manly and generous to a fault, a good friend and a bitter enemy. We liked him because he was much more broad-minded than the rest. If he promised a thing, that thing would be done and he would take the trouble to see himself that it was done, and not be content with simply giving the order. * * * He was very strong ; in fact, the Manipuris used to. tell us that he was the strongest man in the country. He could lift very heavy weights and throw long distances * * * The *Sena'pati* was a magnificent rider, and he was always mounted on beautiful ponies."

—*My Three Years in Manipur*, *Chap. II.*

—সত্য বটে, তিনি চলচ্ছক্তিবিহীন হইয়া শয্যাগত ছিলেন; সত্য বটে, তাঁহার সুখের সময়ের সুহৃদেরাই অন্তিমে শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; কিন্তু ক্ষত্রিয় সন্তানের অন্তিমশয্যাতেও কি একখান তরবার মাত্র ছিল না?—ইংরাজসৈন্য তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিতে আসিলে তিনি সেই শেষ সম্বলের শরণাপন্ন হইয়া আত্ম-প্রতিশ্রুতি কেন রক্ষা করিলেন না?—ফলতঃ, টীকেন্দ্রজিতের দুরপনেয় কাপুরুষ্য-কলঙ্ক মণিপুর-ইতিহাসের পত্রে পত্রে জড়িত হইয়া থাকিল।

এই ঘটনার পাঁচ দিবস পরেই রাজা কুলচন্দ্র তদীয় সহোদরদ্বয় সমভিব্যাহারে চিরনির্ব্বাসনোপলক্ষে তেজপুরে প্রেরিত হইলেন। আমাদিগের মণিপুর-যাত্রার কার্য্যও ফুরাইল; ১৩ই সেপ্টেম্বর, রবিবারে রাজশিশু চূড়া-চাঁদের রাজ্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচনাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, ১৭ই, বৃহস্পতিবার, প্রাতে আমরা শিলং প্রত্যাগমনোদ্দেশে শুভ যাত্রা করিলাম।

* * * * *

স্বর্গীয় চীফ্ কমিশনার কুইণ্টনপ্রমুখ সাহেবগণের স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনের জন্য মণিপুরে অনেক দিন হইতে আয়োজন চলিতেছে। কত দিনে সে চিহ্ন সংস্থাপিত হইবে, বলা সুকঠিন। ইতিমধ্যে, অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে উক্ত সাহেবদিগের সুহৃদগণ কর্ত্তৃক রাজধানী শিলং সহরে এক প্রস্তর-স্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে; পাঠকগণের পরিতৃপ্তির জন্য পার্শ্বে

তাহার এক প্রতিকৃতি দিলাম। স্তম্ভগাত্রে এই কয়েকটী কথা লিখিত আছে :—

In memory of
James Wallace Quinton, C. S. I., I. C. S.
Colonel Charles McDowal Skene, D. S. O., I. S. C.
Frank St. Clair Grimwood, I. C. S.
William Henry Cossins, I. C. S.
Lieut. Walter Henry Simpson, I. S. C.
Lieut. Lionel Wilhelm Brackenbury, I. S. C.
who lost their lives
at Manipur
On the 24th of March 1891
This monument has been erected by friends
in Assam and elsewhere.

অতীতের স্মৃতি এই স্তম্ভে অনেকটা প্রস্ফুট, সন্দেহ নাই; কিন্তু বিপ্লব-ব্যাপারের মর্ম্মভেদী স্মৃতি মণিপুরীর হৃদয়ে আর এক প্রকরণে সন্নিবিষ্ট। বৈষ্ণব-প্রধান মণিপুর-রাজ্যে গোবিন্দজীর মন্দির এক অমূল্য সম্পত্তি; আজ কিন্তু তাহার অতি শোচনীয় পরিণাম!—মন্দিরের অধিষ্ঠাতা গোবিন্দজী এখন কোন ভগ্নহৃদয় মণিপুরীর অন্তঃপুর-প্রকোষ্ঠে লুক্কায়িত, আর সেই বৈষ্ণবের দেবমন্দির ইংরাজ-রাজের বারুদখানায় পরিণত। শত প্রস্তরস্তম্ভাপেক্ষা গোবিন্দ-মন্দিরের এই